Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: সাদিয়া আফরিন

রোলঃ 227021878

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: সাদিয়া আফরিন

রোলঃ 227021878

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: সাদিয়া আফরিন, আইডিঃ 227021878 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোসাঃ সাদিয়া আফরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোসা: সাদিয়া আফরিন

আইডিঃ 227021878

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﷺ بِالْهُدَى الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﷺ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ ﷺ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَعَلَى آلِهِ ﷺ
وَصَحْبِهِ ﷺ أَجْمَعِين

সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের মালিক পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। মানবজাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মদ ﷺ এবং তার আত্নত্যাগী পরিবার - পরিজন ও সাহাবা কেরামের প্রতি লাখো কোটি দুরুদ ও সালাম।

ইসলাম হলো শান্তি প্রিয় ধর্ম। আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এই প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের প্রিয় নবি ﷺ কে প্রেরণ করা হয়েছিলো মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে ও মানুষ জাতিকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং মানুষকে ইসলামের দাওয়াহ দিতে।

আল্লাহ তা‘আলার বলেন,

-وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

‘আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্ত্ততঃ তারাই হ’ল সফলকাম’ (আলে ইমরান ৩/১০৪)।

আমাদের প্রিয় নবি ﷺ আমাদের ইসলামের দাওয়াহ দিয়ে গেছেন, ইসলামকে আঁকড়ে ধরা শিখিয়েন।আচারণে- উচ্চারণে আখলাক ও চরিত্রগুনে, নীতি ও আর্দশে তিনি ছিলেন সর্বযুগের মানুষের জন্য অনুকরনীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি আর আমৃত্যু জীবনদশায় আমাদের মাঝে দাওয়াহ দিয়েছেন। তাঁর এই দাওয়াহ কাজে সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন তার সাহাবা গণ। শুধু পুরুষ সাহাবিরাই নয়, বরং নারী সাহাবিরাও

এই মহান দায়িত্বের ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। দাওয়াহ কাজে,সমাজ গঠন কাজে, জিহাদে, জিহাদে আহত সাহাবিদের সেবিকা হিসেবে তাদের চিকিৎসা করে, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে কখনো স্বামী , স্বামী ও সন্তানকে জিহাদের কাজে অনুপ্রেরণা দিয়ে। আবার কখনো কখনো নারী সাহাবিরা নিজেরাই জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন শত্রুদের দমন করতে। আমাদের অনেক নারী সাহাবীরা ইসলাম এর জন্য অনেক ত্যাগ করে গেছেন। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই ইসলামে নারীদের একটি সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইসলামে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতার উপর জোর দেয়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন ছিল। বিশেষত আরব সমাজে। আরবরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপছন্দ করত। তাদের কেউ মেয়েকে জ্যান্ত দাফন করত যেন মাটির নিচে তার মৃত্যু ঘটে। আবার কেউ অসম্মান ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপনে মেয়েকে বাধ্য করত। মেয়েদের জীবিত দাফন করা হয় যেন মাটির নীচে মারা যায়। কোনো কন্যা যদিও জ্যান্ত দাফন থেকে নিষ্কৃতি পেত, কিন্তু লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পেত না। একজন নারীকে একাধিক পুরুষের সাথে থাকতে হতো। তাদের দাসী হিসেবে রাখা হতো,তাদের মতের মর্যাদা ছিলো না।

কিন্তু ইসলাম আসার পর নারীর ন্যায্য-যোগ্য-প্রাপ্য সব অধিকারই প্রদান করল ইসলাম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল অধিকার নিশ্চিতও করল।এমনকি মৃত্যুর পরও। পরবর্তীতে নারীরা ইসলাম প্রচারে অনেক দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَبِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি (খেজুরের আঁটির পিঠে) বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না (সূরা নিসা:১২৪)

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবরা নিজেদের আত্মমর্যাদা ও ইজ্জত সম্মানের দিকটি অধিক বিবেচনা করার কারণে, তাদের নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অশুভ ও অসম্মানজনক আচরণ হতে পারে এ আশঙ্কায় তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করে ফেলত। বিশেষ করে, তাদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত পরিবার বলে পরিচিত ছিল, তারা তাদের সম্মান ও মর্যাদাহানিকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারত না। তাই তারা মনে করত, তাদের নিকট কন্যা সন্তানদের হত্যার কোনো বিকল্প নাই।'মাওউদাতু' সে মেয়েকে বলা হয়, যাকে জীবিত দাফন করা হয় যেন মাটির নীচে মারা যায়। কোনো কন্যা যদিও জ্যান্ত দাফন থেকে নিষ্কৃতি পেত, কিন্তু লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পেত না। নারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পদ যদিও প্রচুর হত, কিন্তু তার মৃত্যুর পর নারী কখনো মিরাসের অধিকারী হত না, যদিও সে হত অভাবী ও খুব সংকটাপন্ন! কারণ তাদের নিকট পুরুষদের জন্য মিরাস খাস ছিল, নারীদের তাতে কোনো অংশ ছিল না, বরং নারীরা মৃত স্বামীর সম্পদের ন্যায় মিরাসে পরিণত হত। ফলশ্রুতিতে এক পুরুষের অধীন অনেক নারী আবদ্ধ হত, যার নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ছিল না। একাধিক সপত্নী বা সতীন থাকার কারণে নারীরা যে সংকীর্ণতা, যুলম ও কোণঠাসা অবস্থার সম্মুখীন হত -সেটাও তাদের অনেকের নিকট বিবেচ্য ছিল না।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৭/৫১১৩]

তাদেরই এক শ্রেণির লোক এমন ছিল, যাদের নিকট তুলনামূলক কিছুটা হলেও নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের সাথে ভাগে ব্যবহার করার প্রচলন ছিল; কিন্তু এ অবস্থাও বিভিন্নভাবে নারীদের অধিকারকে ঘোলাটে করে ফেলত এবং তাদেরে তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হত। ফলে এক কথায় বলা চলে তৎকালীন আরব সমাজে নারীর অধিকার বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। প্রতিনিয়তই তাদের ইজ্জত ও সম্মান লুণ্ঠিত হত এবং তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হত। জাহেলিয়াতের যুগে নারীদেরকে তাদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হত। তাদেরকে সাধারণত কোনো সম্পদের মালিক করা হত না, যার কারণে জাহেলিয়্যাতের যুগে আরবের নারীদের মালিকানা বলতে কিছুই ছিল না।

জাহেলিয়াতের যুগে স্বামীর তালাক অথবা মৃত্যুর পর তার পছন্দানুযায়ী অপর কোনো পুরুষের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ফলে একজন নারী তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীহারা হলে তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা ও সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হত এবং তাকে বাধ্য হয়ে অতি কষ্টে কালাতিপাত ও জীবন-যাপন করতে হত।

জাহেলিয়্যাতের যুগে নারীরা তাদের নিজদের ধন-সম্পদ নিজেরা ভোগ করতে পারত না। তাদের সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। ফলে তারা ইচ্ছা করলেও তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারত না। মোহরানা হিসেবে তাদের যে টাকা (অর্থ কড়ি) দেওয়া হত, তাও স্বামীরা তাদের থেকে আত্মসাৎ করে নিয়ে নিত। তারা নারীদের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করত ও তাদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে তাদেরকে গৃহাভ্যন্তরে আটক করে রাখত। ফলে তারা অন্য কোনো স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না।

অন্যান্য ধর্মে নারীদের স্থান

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের ধর্ম

ধর্মীয় দিক থেকে অজ্ঞতার যুগে আরবরা সাধারণভাবে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। (১) ইহুদি (২) খ্রিস্টান (৩) প্রকৃতিপূজক ও মূর্তি উপাসক এবং (৪) হানিফ সম্প্রদায়। এ সময় ইহুদিরা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সম্পর্কে কোনরূপ সঠিক ধারণা দিতে অক্ষম ছিল। তারা অজ্ঞতাবশত "জাহোবা" কে বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মনে করতো। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তারা বৈষম্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। ইহুদি ধর্মের ন্যায় খ্রিস্ট ধর্ম ও ভ্রান্তির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে তিন খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং ইহুদি কিংবা খ্রিস্ট কোনো ধর্মই আরবের নৈতিক ও পার্থিব অবস্থার উপর কোনো কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

*ইহুদি ধর্মে নারী

তাওরাতে লিখা আছে নারী মৃত্যুর চেয়েও বেশি তিক্ত। (তামাদ্দুনে আরব : ৩৭৩)।

ইয়াহুদিদের বিশ্বাস্য কিতাব 'আহাদ নামায়ে আতিক' নারী জাতি সম্পর্কে লেখা আছে- নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আরাম পরিবেশন করা। নারী পাপের প্রবণ। প্যূজনক কাজ করার কোন যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে সে মান সম্মানের যোগ্য হতে পারে না।

ইয়াহূদীদের গ্রন্থে আরেকাঢ প্রাথনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মুর্তিপুজারী করে সৃষ্টি করেন নি। প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করেন নি, আর প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মূর্খ করে সৃষ্টি করেন নি।[Swidler, op. cit., pp. 80-81]

হিন্দু ধর্মে নারী

সংস্কৃত না জানেন তাহলে অভিবাদনের পর অভিবাদনীয় ব্যক্তিকে 'আমি অভিবাদন করছি'-এই কথা বলবেন। স্ত্রীলোকদেরকে এইভাবেই অভিবাদন করবেন।" ২/১২৩

নারীরা পুরুষদের ন্যায় সংস্কৃত জানেন না, তাই প্রকাশ পাচ্ছে এই শ্লোকে।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও যে মহিলাদের ছিল না তা পরিষ্কার হয় মনুসংহিতার নিচের শ্লোক থেকে-

"যেহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই স্ত্রীজাতির জাতকর্ম সংস্কার পালিত হয় না তাই তাদের অন্তকরণ নির্মল হয় না। স্মৃতি শাস্ত্র ও বেদ প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্রের ওপর স্ত্রীজাতির কোনো অধিকার নেই। তাই তারা ধর্মজ্ঞ হতে পারে না।এমনকি কোনো মন্ত্রের ওপরেও স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায় তারা কোনো পাপ করলে মন্ত্রের সাহায্যে তা ক্ষালন করতে পারে না। তাই শাস্ত্রমতে স্ত্রিজাতি মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ।" ৯/১৮

আরো বলা হয়েছে,

"স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথক যজ্ঞ নেই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্রত এবং উপবাস নেই। কেবলমাত্র স্বামীর সেবা করেই স্ত্রীলোক স্বর্গে যেতে পারেন।" ৫/১৫৫

শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

“বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। সেখানে স্বামীর সেবাই হল গুরুকূলে বাস এবং স্বামীর গৃহ কর্মই হল প্রাতঃসন্ধ্যাকালীন হোমরূপ অগ্নি পরিচর্যা।”২/৬৭

হিন্দু ধর্মে নারীদের অধিকারের ব্যাপারে কোনো লক্ষ্যই রাখেনি। এ ধর্মের মতো এতো কঠোর বিধান অন্য কোনো ধর্মে নেই। সতীদাহের মতো নির্মম অমানুষিক বিয়ে কিংবা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করার অনুমতি লাভ করতে পারে। কিন্তু নারী স্বামী হারানোর পর বেঁচে থাকাতো দূরের কথা, আরেক বিয়ে তো দূরের কথা, স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ না হলে মৃত স্বামীর সঙ্গে ছটফট করে পুড়ে মরতে না পারলে তার স্বর্গ লাভ হবে না। যদি কোনো নারী এই সতীদাহ হতে বেঁচেও যেত; ঘরে সমাজে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের কাছে তার কোনো সম্মান থাকতো না। তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনায় এমনভাবে বিদ্ধ করা হতো, যার ফলে তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয় মনে হতো।

হিন্দু ধর্মে স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর জীবন সুখের কিন্তু অসৎ হলে তার জুলুম নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেবার কোনো পথ রাখেনি। এমনকি স্ত্রীর সঙ্গে ‘অসদাচরণ করা পাপ’ এ কথাও বলে দেয়নি স্বামীকে বরং উল্টো বলা হয়েছে, নারী দিন রাত্রীর কোনো সময় স্বাধীন থাকতে পারবে না, সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর থাকবে। (মনু) নারী স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত নয়। (মনু) বাবা মেয়েকে যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন সেখানেই আজীবন থাকতে হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোনো পুরুষের ঘর সংসার করতে পারবে না। অর্থাৎ আজীবন বিধবা হয়ে থাকতে হবে। হিন্দু আইনে আছে- অদৃষ্ট নরক, বন্য ও বিষধর সর্প এর কোনোটাই নারীর সমান ক্ষতিকর নয়।

খৃস্টান ধর্মে নারী

তারতুলিয়ান নামে খৃস্টান ধর্মের প্রাথমিক যুগের ধর্মগুরু ছিলেন। তিনি নারী সম্বন্ধীয় খ্রিস্টীয় চিন্তাধারা নিম্নভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

‘সে শয়তান আগমনের দ্বার স্বরূপ, সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের আকর্ষণকারিণী আল্লাহর আইন ভঙ্গকারিণী এবং আল্লাহর প্রতিমূর্তি পুরুষের ধ্বংসকারিণী। ক্রাই সোসটাম নামে একজন বড় ধর্মগুরু রয়েছে; তিনি বলেন- নারী একটি অনিবার্য পাপ। একটি

জন্মগত কু-প্ররোচনা, একটি আনন্দায়ক বিপদ, একটি পারিবারিক আশংকা, একটি ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী এবং একটি সজ্জিত দুর্ঘটনা।

বৌদ্ধ ধর্মেও নারী অধস্তন

বৌদ্ধ সমাজ সাধারণত হিন্দু আইন মেনে চলে। তাদের আলাদা কোনো আইন নেই। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মেও নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে
বঞ্চিত। বিয়ে বিচ্ছেদেরও উপায় নেই।

নারী সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের প্রবাদ

রুশ প্রবাদ : দশটি নারীতে একটি আত্মা
ইটালীয় প্রবাদ : ঘোড়া ভালো হোক কি মন্দ, মারপিটের প্রয়োজন, নারী ভালো হোক কি মন্দ তার মারপিটের প্রয়োজন
স্পেনিশ প্রবাদ : কুৎসিত রমণী থেকে দূরে থাকা উচিৎ কিন্তু সুন্দর রমণীর ওপর ভরসা করা উচিৎ নয়। (তামুদ্দুনে আরব- ৩৭৮)।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ইয়াহুদী খৃষ্টানরা নারীদের মর্যাদা দেয় নি। অমুসলিমরাও নারীদের মূল্যায়ন করেনি। বরং ইসলামই নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছে।

মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা সমাজে নারীর উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। আদি ইতিহাস থেকে দেখা যায় ক্রমান্বয় সভ্যতা নারীকে কিছুই নিতে পারেনি। অথচ তার অমূল্য সম্পদ, শ্রম সাধনা সবকিছু হরণ করে শোষণ করে নিয়েছে নির্মমভাবে। নারী জাতিকে এহেন শোচনীয় অমর্যাদা-এর গহীন গহ্বর থেকে তুলে এনেছে ইসলাম। ইসলামই যুগ যুগ সঞ্চিত অপমান লাঞ্ছনা হীনতার পূঞ্জীভূত স্তুপ থেকে পূর্ণ মুক্তি দান করেছে মহিলাদের।

ইসলাম এসে নারীর ওপর থেকে এসব যুলম দূরীভূত করেছে, তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে পুরুষদের ন্যায় মনুষ্য অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾ [الحجرات : ١٣]

"হে মানব জাতি, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নারী পুরুষের সঙ্গী, যেমন সে পুরুষের সঙ্গী নেকি প্রাপ্তি ও শাস্তির ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

"যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব"। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৭]

যখন প্রথম কালেমায়ে শাহাদাত এর দাওয়াহ আসে তখন সর্বপ্রথম এর ঘটনা খাদিজা(রা) কে রাসুলﷺ বলেছিলেন। খাদিজা (রা) তা বিশ্বাস করেছিলেন এবং রাসুলকে অভয় দান করেছিলেন। তার এই প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে তাঁকে আসমান থেকে সালাম পাঠিয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে নারীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে। বুদ্ধি, প্রতিভা শক্তি প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই যেকোনো একজন মহিলা পুরুষের পাশাপাশি আপন সংসার, স্বামী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন তথা দেশের কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে বিশেষভাবে সক্ষম। সুতরাং পরিবারের একজন স্ত্রী বা মহিলা সংসার তথা দেশের সার্বিক কল্যাণে অবশ্যই বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

*কন্যার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ

ইসলাম নারীকে তার সঠিক স্থান দান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাদের সঙ্গে সদাচারণ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যা সন্তান প্রতিপালন করবে এবং দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দেবে ও সৎ পাত্রস্থ করবে; আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। (রিয়াযুস সালেহীন পৃঃ ১৪৬)।

*হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদা এক স্ত্রীলোক দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার নিকট আগমন করলো স্ত্রী লোকটি অসহায় ও নিঃস্ব ছিল। সে আমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করল। আমার নিকট তখন একটি মাত্র শুকনো খেজুর ছিল। আমি সেটা তাকে দান করলাম। সে খেজুরটি দু টুকরো করে দু সন্তানকে দিলো নিজে একটু খেলো না। তারপর উঠে চলে গেল। ইত্যবসরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্দরে প্রবেশ করলেন। আমি এ ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে কেউ তার কন্যাদের জন্য কষ্ট সহ্য করবে, তাদের ভালো ব্যবহার করবে তার জন্য এ কন্যারা দোযখে ঢাল স্বরূপ হবে। (বুখারী মুসলিম) অর্থাৎ দোযখের আগুন কন্যা প্রতিপালনকারীদের স্পর্শ করবে না।

এখানে কন্যাদের জন্য কষ্ট সহ্য করার প্রতিফল দেখানো হয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমে জাহেলি যুগদের মানুষকে সচেতন করা হয়েছে কন্যা হত্যা মহাপাপ বরং সে কন্যার জন্য কষ্ট সহ্য করবে সে কন্যা তার দোযখ ঢাল স্বরুপ হয়ে দাড়াবে

*সালামা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু‘ফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল(সা.) ! আমাদের মাতা মুলাইকা আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতেন, অতিথি সেবা করতেন। এছাড়া অন্যান্য ভাল আমল করতেন। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মারা গেছেন। এসব সৎ আমল তার কোন কাজে আসবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমরা বললাম, তিনি জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের এক বোনকে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছিলেন, এতে তার কোন ক্ষতি হবে কি? নবী কারীম(সা.) বললেন, যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামে যাবে। তবে পরে ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষমা হবে’ (আহমাদ হা/১৫৮৬৬; ইবনু কাছীর ২/৭১৬৭)

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ﴾ [الاحزاب : ٧٣]

“যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের ‘আযাব দেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭৩]

আল্লাহ তা‘আলা মৃত ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় নারীকে পরিত্যক্ত মিরাস গণ্য করা হারাম করেন। যেমন তিনি বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ﴾ [النساء : ١٩]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

এভাবে ইসলাম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে তাকে ওয়ারিশ ঘোষণা দেয়। কারণ, সে পরিত্যক্ত সম্পদ নয়। মৃত নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মিরাসের হক প্রদান করে তাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧﴾ [النساء : ٧]

"পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ, তা কম হোক বা বেশি হোক, নির্ধারিত হারে"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ﴾ [النساء: ١١]

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদেরকে ক্ষেত্রে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক ..."। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১]

এভাবে আল্লাহ একজন নারীকে মা, মেয়ে, বোন ও স্ত্রী হিসেবে মিরাস দান করেন। আর বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেন, শর্ত হচ্ছে নারীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও তাদের সাথে প্রচলিত রেওয়াজ মোতাবেক আচরণ করতে হবে। তিনি বলেন:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে আচরণ কর"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

অধিকন্তু নারীর জন্য পুরুষের ওপর দেন-মোহর অবধারিত করে তাকে তা পরিপূর্ণ প্রদান করার নির্দেশ দেন, তবে নারী যদি স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ সন্তুষ্টিতে কিছু হক ত্যাগ করে সেটা পুরুষের জন্য বৈধ। তিনি বলেন:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤ ﴾ [النساء: ٤]

"আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহ খাও"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪]

ইসলাম নারীকে তার স্বামীর ঘরে আদেশ ও নিষেধকারী জিম্মাদার এবং স্বীয় সন্তানের ওপর কর্তৃত্বকারী অভিভাবক বানিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»

“নারী তার স্বামীর ঘরে জিম্মাদার এবং তার জিম্মাদারি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে”।[*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯; তিরমিযী, হাদীস নং ১৭০৫, আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯২৮, আহমদ: (২/১২১)]*

রেওয়াজ মোতাবেক নারীর খরচ ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব করেছেন।

কুরআনে বেশ কিছু নারীর নাম রয়েছে যারা ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুরআন মুসলিম মহিলাদের জন্য অসংখ্য আয়াত এবং সূরা উৎসর্গ করেছে: তাদের ভূমিকা, কর্তব্য এবং অধিকার।

যেমন নারী নামে একটি সুরাও অবতীর্ণ করেছেন, যার নাম ‘সুরা আন-নিসা’। পবিত্র কোরআনে ‘নিসা’ অর্থাৎ ‘নারী’ শব্দটি ৫৭ বার এসেছে। ‘ইমরাআহ’ অর্থাৎ ‘মহিলা’ শব্দটি এসেছে ২৬ বার।

সূরা -মরিয়ম,

এই সূরাটি মরিয়ম (আল্লাইহি ওয়াসল্লাম)

এর নামানুসারে ।

পবিত্র কোরআন মজিদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে;

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَالْقُنِتِينَ وَالْقُنِتْتِ وَالصّدِقِينَ وَالصَّدِقْتِ وَالصُّبِرِينَ وَالصُّبِرَاتِ وَالْخُشِعِينَ
وَالْخُشِعْتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّبِتِ وَ الْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظْتِ وَ
لا الذُّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرْتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

(সূরা আহযাব:৩৫)

অনুবাদ: “নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী--এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।”

ইসলাম বিস্তারে নারীর ভূমিকা

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি।

ইসলাম নারীকে মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদায় পুরুষের সমান অংশীদার মনে করে।

মানবসভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।' (সুরা: হুজরাত, আয়াত: ১৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে ঈমানের সঙ্গে ভালো কাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।' (সুরা: নিসা, আয়াত: ১২৪)

ইসলাম প্রচারে পুরুষদের মতো নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবজীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই নারীরা হলো পুরুষদের সহোদরা।'

পবিত্র কোরআনে এমন একাধিক নারীর উল্লেখ রয়েছে, যারা মানব ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন, '(বহু) পুরুষ নারীর সমতুল্য নয়।' (সুরা: আলে-ইমরান, আয়াত: ৩৬)। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নারীরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে সোনালি ইতিহাস গড়ে গেছেন।

নারীরা হচ্ছে পুরুষদের সহযোদ্ধা। তাই পুরুষদের মধ্যে যেমন রয়েছে বিজ্ঞ আলেম ও প্রথিতযশা দাঈ, তেমনি রয়েছে নারীদের মাঝেও। পুরুষদের মাঝে যেমন রয়েছে দিনের সিয়াম পালনকারী ও রাতের তাহাজ্জুদগুজার নারীদের বেলায়ও আছে তেমন। অনেক নারীতো পুরুষকেও ছাড়িয়ে গেছে সৎকর্ম ও ইবাদত বন্দেগীতে, এমনকি দীনের সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রেও। এছাড়া বড় বড় বহু শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নারীরাই সর্বপ্রথম অর্জন করেছে। সর্বপ্রথম যিনি পবিত্র হারামে বসবাস শুরু করেছেন, সাফা-মারওয়ায়

সায়ী করেছেন, তিনিও তো একজন নারী। তিনি হচ্ছেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মা হাজেরা (আ)। এছাড়া যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, তিনিও তো একজন নারী। তিনি হলেন হযরত খাদীজা (রা)। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, যিনি সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য যুলুম-নির্যাতন এবং দ্বীনের পথেশাহাদাতবরণ করেছেন, তিনিও তো একজন নারী। তিনি হলেন আম্মার বিন ইয়াছিরের জননী হযরত সুমাইয়া (রা)।

ইসলামের বিস্তারে বিভিন্নভাবে নারী সমাজ অবদান রেখেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজিক ক্ষেত্রে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, জিহাদের ক্ষেত্রে।

*ইসলাম ধর্মে প্রথম যিনি দীক্ষিত হন তিনি একজন নারী। হযরত খাদিজাতুল কোবরা (رضى الله عنه)।

*ইসলাম ধর্মে প্রথম যিনি প্রথম শাহাদাত বরন করেন তিনি একজন নারী। হযরত সুমাইয়া (رضى الله عنه)।

*ইসলামের নবী রাসুলেপাক (ﷺ) এর নবুওতের কথা যিনি প্রথম জানতে পারেন তিনি একজন নারী। হযরত খাদিজাতুল কোবরা (رضى الله عنه)।

*রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মিরাজ গমনের কথা যিনি প্রথম জানতে পারেন তিনি একজন নারী। হযরত উম্মে হানী (رضى الله عنه)।

*রাসুল (ﷺ) এর নুরানী পবিত্র বংশধারা কিয়ামত পর্যন্ত যার মাধ্যমে পৃথিবীতে অব্যহত থাকবে তিনি একজন নারী। নবী তনয়া হযরত ফাতেমা (رضى الله عنه)।

*রাসুল (ﷺ) এর পারিবারিক জীবনের ব্যাপক তথ্যদি সুন্দরভাবে হাদিসের মাধ্যমে যিনি আমাদের জানিয়েছেন তিনি একজন নারী। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (رضى الله عنه)। যার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০।আয়েশা (রা.); হাদিস বর্ণনা, ইসলামী আইন, ফিকহ, ইতিহাস, বংশলতিকা, কবিতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) ও উম্মে আবিদুল্লাহ বিন জুবায়ের; তারা উভয়েই হাদিস বর্ণনায় দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন।

*হযরত হোসাইন (رضى الله عنه) এর কন্যা হযরত সকিনা (رضى الله عنه) সে যুগের প্রভাবশালী বিদুষী গুনবতী মহিলা ছিলেন।

*খলিফা হরুনুর রশিদ (رحمة الله عليه) এর স্ত্রী জুবাইদা (رحمة الله عليه) জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।
*বসরার হযরত রাবেয়া বসরী (رحمة الله عليه) এর অধ্যাত্বিক সাধনা বিশ্বের এক অবিস্বরনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।
*আয়েশা বিনতে তালহা; তিনি কবিতা, সাহিত্য, জ্যোতিষশাস্ত্র ও নভোমণ্ডল বিষয়ে অত্যন্ত পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সাকিনা বিনতে হোসাইন ও খানসা; তারা কাব্য ও সাহিত্যে প্রবাদতুল্য ছিলেন।

*ভারতবর্ষের চাঁদ সুলতানার বীরত্ব, নুরজাহান ও রাজিয়ার রাষ্ট পরিচালনা, জেবুন্নেসা কুদসিয়া ও জাহানারার অসাধারন ধীশক্তি ও সাহিত্য সাধনা নারী জাতির ইতিহাসে এক গৌরব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাসুলের জামানায় উম্মাহর নারীদের অবদান

রাসুলের যুগে নারীরা বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করেছে। কখনো স্বামি ও সন্তানকে জিহাদের অনুপ্রেরনা দিয়ে, একজন যোগ্য সন্তান দান করে। পরিবার গঠনে,রাজনৈতিক গঠনে, সেবিকা হিসেবে, সমাজগঠনে,আবার কখনো কখনো নিজে জিহাদে অংশ নিয়েছে।

ক.পরিবার গঠনে নারীদের ভূমিকা

জাতির জন্য, দেশের জন্য নারীর সবচেয়ে বড় অবদান, সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে এই সুসন্তান। পৃথিবীর সকল সমাজ সংস্কারক বৈজ্ঞানিক কবি লেখক চিন্তাবিদদের এই মহিলারাই প্রতিপালন করেছেন। শুধু প্রতিপালন করেছেন তাই নয় সন্তানের জীবন গঠন, জীবনের দিক নির্দেশনাতেও তারা অমূল্য অবদান রেখেছে।

রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে পরিবার গঠনে নারীরা ছিলো অনেক বেশি দায়িত্ববান। তারা স্বামীদের অনুগত্য করতেন, সন্তানদের সঠিক জ্ঞান দিতেন,শহীদ হবার তামান্না দেখাতেন। তাদের দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক ছিলো কম, তাঁরা দুনিয়া খুজতেন কম এবং আখিরাত খুজতেন বেশি। রাসুল ﷺ যখনই জিহাদের জন্য ডাকতেন তখনই নারী সাহাবারা সকল সুখ,আনন্দ, দুনিয়ার লোভ ত্যাগ করে স্বামী, সন্তানকে দিয়ে পাঠাতেন জিহাদের ময়দানে। সন্তানদের দান করতেন রাসুল ﷺ এর খেদমত করার জন্য।

রাসুল ﷺ তার পারিবারিক জীবন শুরু করেছিলেন বিবি খাদিজার(রা) সঙ্গে। একদিকে তরুণ যুবক মুহাম্মদ ﷺ যেমন ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে আমানতদার, চরিত্রবান, সত্যবাদী আদর্শ যুবক-যার পরিচয় ছিল আল আমিন-আল সাদিক তেমনি বিবি খাদিজা ছিলেন সৎচরিত্রা আদর্শ মহিলা। তারও পরিচয় ছিল তাহেরা বা পবিত্র। এই পরিবারটি ছিল একটি আদর্শ পরিবার। খাদিজা তাহেরা ছিলেন অঢেল সম্পদের অধিকারী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার স্বামী মুহাম্মদ (সা)-এর মিশন কী? সেই মিশন বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত সম্পদ তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। এ মহান ব্যক্তির জন্য শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। প্রৌঢ় বয়সে তিনি হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন স্বামীর খাবার পৌঁছে দিতেন। তাঁর এ কার্যকলাপে খুশি হয়ে জিবরাইল (আ) তাঁকে সালাম পৌঁছেছেন। পারিবারিক জীবনে এ দম্পতি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও শান্তিময়। খাদিজার (রা) মৃত্যুর পরও রাসূল (সা) তাকে স্মরণ করতেন। কোন বকরি জবাই হলে খাদিজার বান্ধবীদের হাদিয়া পাঠাতেন।

** .রাসুল (সা) এর শেষ কন্যা হজরত ফাতেমা (রা)। তিনি তার দুই সন্তানকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নিজে চাতা পিছে যবের আটা বানিয়ে তারপর রুটি করে খেয়েছেন তবুও কোনদিন তার স্বামির কাছে অভিযোগ রাখেননি। তিনি নিজের জন্য কোনো খাদিমা রাখেননি।

**ধৈর্যশীলা মুজাহিদ উম্মু আম্মারা (রাঃ) একজন নামকরা মহিলা সাহাবী। দ্বিতীয় আকাবার বায়‘আতে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে যারা বায়‘আত নিয়েছিলেন তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন উম্মু আম্মারা। এই বায়‘আতের মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামে নারী

জাতির মর্যাদা নিরূপণে নতুন এক ধারা সংযোজন করেছিলেন। যে ধারার সাথে জড়িয়ে আছে উচ্চাঙ্গের অনেক মূল্যবোধ, যা মেনে চললে নারীর মর্যাদা উন্নত হবে, তাদের শানশওকত উঁচু হবে।ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী তার 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, উম্মু আম্মারা ছিলেন আকাবার প্রান্তরে শপথকারিনী, সামর্থ্যবান পুরুষ ও বৃদ্ধদের হয়ে যুদ্ধকারী। তিনি যেমন ছিলেন পরিশ্রমী তেমনি ছিলেন ইজতিহাদকারী ভাবুক। অধিকন্তু নিয়মিত ছিয়াম পালনকারী, ইবাদতগুযার ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

(আবু রাগেব আস্ফাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৬৪)

সন্তান প্রতিপালনে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সন্তানদেরকে ইসলামের নানা দিক শেখানোর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের হৃদয়কন্দরে ইসলাম ও তার মূল দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা এই নির্মল ঝরণা থেকে পানি পান করতে থাকেন। এমনি করে তিনি তাদের সত্যের পথের বীরপুরুষ করে গড়ে তোলেন। তারা যাতে জিহাদে ও সাহসিকতায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন সেটাই ছিল তার কাম্য।উম্মু আম্মারা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রত্যেক মায়ের প্রথম দায়িত্ব হকের পথে দাওয়াত তথা হক গ্রহণ ও পালনের জন্য মানুষকে আহবান জানান। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, এ কাজটা শুরু করতে হবে পরিবারের ভিতর থেকে, নিজের সন্তানদের মাধ্যমে। তার বিশ্বাস ছিল, নিজ সন্তানদের প্রতি নযর না দিয়ে পরিবারের বাইরের লোকদেরকে যেকোন ধরনের দাওয়াতই দেওয়া হোক না কেন তা এক প্রকার বোকামী বলে গণ্য হবে। এজন্য তিনি চেষ্টা করেছেন এবং অবিচল থেকেছেন তার সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে যোগ্য ও ভালো মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলতে। ইসলাম কি, আর তার মূলভিত্তিই বা কি, এ বিষয়টি তিনি তার সন্তানদের ভালো করে তালকীন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তাদের অন্তরে তা প্রোথিত করে দিয়েছেন। তিনি তার সন্তানদের উত্তমরূপে প্রতিপালন করেছেন।ফলে তিনি তাদের অন্তর ভরে দিয়েছেন ঈমান দিয়ে; বক্ষ ভরে দিয়েছেন সাহস ও বীরত্ব দিয়ে এবং বাহু ভরে দিয়েছেন শক্তি দিয়ে। এই যোগ্য প্রতিপালনের ফল ফলতে খুব একটা দেরি হয়নি। দ্রুতই বাস্তব জগতে তার ফল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। তার ফলে সমাজে আবির্ভূত হয় এমন সব যুবক, যারা ভালবাসেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে; ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের ভালবাসার খাতিরে ইসলামের যেকোন কাজে। বস্তুত তিনি, তার দুই পুত্র হাবীব ও আব্দুল্লাহ এবং স্বামী

যায়েদ আনছারী জিহাদ ও ত্যাগের ক্ষেত্রে উঁচু নমুনা রেখে গেছেন। আমরা অন্তত দু'টি ঘটনায় সে নমুনা স্পষ্টত দেখতে পাই।
(ওয়াকেদী, মাগাযী ১/২৬৮)

**উম্মে আনাস ইবনে মালেক (রা.) সম্পর্কে হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত আবু তালহা রা. উম্মে সুলাইমকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। উম্মে সুলাইম বলেন, আমার ছেলে আনাস প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং ইলমের মজলিসগুলোতে না বসা পর্যন্ত আমি বিবাহ করবো না। হযরত আনাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার আম্মাকে উত্তম বিনিময় দান করুন তিনি আমাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছেন। হযরত আনাস রা. ইলম শেখা আরম্ভ করার পর তিনি আবু তালহা রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।-(তবাকাতে ইবনে সা'দ ৮ : ৩১১)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস রা. যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তার আম্মা হযরত উম্মে সুলাইম তাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমার ছেলে আনাস। আজ থেকে আপনার খেদমত করবে। তখন থেকেই আনাস রা. নিয়মিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূলের খাদেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।(প্রাগুক্ত)

♣ উম্মে আনাস চাইলে কি পারতেন না এতো ভালো ভালো বিয়ের প্রস্তাব গুলায় বিয়ে করতে ফেলতেন,তাছাড়া তিনি ছিলেন রুপে গুনে সবদিক থেকে সেরা। কিন্তু তিনি এতো ভালো প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র আনাস(রা) এর কথা ভেবে। কারন তিনি জানতেন তিনি বিয়ে করে নিলে আনাস(রা) ভালো প্যারেন্টিং পেতেন না। যখন আনাস(রা) একটু প্রাপ্ত বয়স হলো তখন তিনি নবিﷺ এর জন্য তাঁর নিজ পুত্রকে খিদমত এর জন্য দিয়ে দিলেন। কারণ তিনি ভালো করে জানতেন জান্নাতের সর্দার রাসুল ﷺ এর মতো ভালো প্যারেন্টিং আনাস (রা) কোথাও পাবেন না।

খ. জ্ঞানচর্যায় নারীদের অবদান

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। ইসলামের প্রথম যুগে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েরাও অধ্যয়ন করতেন। তখনও অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। নবী ﷺ নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি নারীদের বিভিন্ন হাদীসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং নারীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। তিমজ শুধু আযাদ মহিলাই নয় ঘরের দাসী বাদীদেরও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করেননি।

***জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা"-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ‘আসমাউর রিজাল’ নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। বালাযুরী বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, ‘‘আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম লাভ করেছি।’’ আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেনঃ

نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعنهن الحياء ان يتفقهن في الدين

‘‘আনসারী মহিলারা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।’

[উম্মুল মু'মিনীন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ইসলামী জ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়া। এমনকি প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। উরওয়া বলেন, তাঁর মত অধিক কবিতা মুখস্থকারী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়া। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০। (মুফতী আমিমূল ইহসান, আসমাউর রিজাল, (ঢাকা, আল বারাকা লাইব্রেরী, ১৯৮৩), পৃ. ২২-২৩।]

[বালাযুরী, ফতুহুল বুলদান, (কায়রো, ১ম সংস্কার, তা. বি.), পৃ. ৪৭২।]

♣আয়েশা (রা) ছিলেন জ্ঞানচর্যায় সেরা। তিনি রাসুল ﷺ এর প্রায় হাদিস মুখস্ত করে ফেলতেন,এতো বেশি তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ আমাদের ও তাঁর অনর্ভুক্ত করুন।

**নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন।

(*আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আছ, কিতাবুত তিবিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০)*

*** বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন।

(*বালাযুরী, ফতুহুল বুলদান, (কায়রো, ১ম সংস্কার, তা. বি.), পৃ. ৪৭২।)*

**অপর একজন আয়েশা যিনি সা'দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।

(*Tuta Khalil, The contribution of the Arabs to education, (New York, 1926), P. 79.)*

** উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।(*ইবনে হাজার আস কালানী, ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।)*

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝা যায়ঃ

''নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।"(*ইবন আবদি রাব্বিহি, আল্-ইকদুল ফরীদ, ১ম খণ্ড, কায়রোঃ মাতবাআতু লাজনাতিত্ তা'লীক, ১৯৬৫, পৃ. ২৭৬।)*

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল্-জুহানিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

''জুম'আর দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।

(ইবন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭)

**হারিসা ইবনু নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ

আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুম'আর খুতবাতে এটি পড়তেন।''

(মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে চর্চা করে চিকিৎসাবিদ,জ্যোতিবির্দ্যায় নিবেদিত হয়েছেন।

([12] ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১)

গ. সমাজ গঠনে

ব্যক্তি ও সভ্যসমাজ বিনির্মাণে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের রয়েছে যথেষ্ট ভূমিকা। কারণ ইসলাম নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে যার যার উপযুক্ত সম্মান ও অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

একটা সমাজ সুন্দর হওয়া সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা, পরস্পরের সম্পর্কের হক আদায় করা এগুলো নির্ভর করে আল্লাহভীতির ওপর। স্বার্থপরতা, নির্লজ্জতা, সম্পর্ক বিনষ্ট করা এগুলো আল্লাহর ভীতির বিপরীত। সব কিছু আল্লাহ দেখছেন, তাঁর কাছে সব কিছুর ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে এই অনুভূতিই মানুষকে ভাল থাকতে, সৎ এবং দায়িত্ববান হতে সাহায্য করে।
ইরশাদ হয়েছে, 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব, যা তারা করত।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৯৭)
সমাজ গঠনে আমাদের নারী সাহাবিরা তার স্বামি ও সন্তান, ভাইদের সাহায্য করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সমাজ গঠন করেছেন। রাসুল(সা) এর বাণি শুনা মাত্রই তা আমল করেছেন।

যখন পর্দার বিধান নাযিল হলো,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. ٍ

'তোমরা যখন নবীর বিবিদের কাছে কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও।' (সূরা
আহযাব: ৫৩)
এ বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল (স) তাঁর বিবিগণের মাঝে এবং ঘরে উপস্থিত সাহাবীগণের মাঝে একটি পর্দা টেনে দিলেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূল (স)-এর যুগে কোনো মেয়েকে এবং নবীর বিবিগণকে আর সাহাবীদের সামনে আসতে দেখা যায়নি।

যখন কুরআন নাযিল হলো,

يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ، ذٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن. َ

'হে নবী, আপনি আপনার বিবিদের, কন্যাদের এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যখন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হয়, তখন যেন তারা নিজেদের উপর একটি বড় চাদর ঝুলিয়ে দেয়, যাতে তাদের চেনা যাবে, তারা উত্যক্ত হবে না।' (সূরা আহযাব: ৫৯)

আল কুরআনে এ নির্দেশ এসে যাওয়ার পর রাসূলের যুগে পর্দাহীনভাবে কোনো মেয়েকে কোনোদিন প্রকাশ্য ময়দানে দেখা যায়নি।

তেমনিভাবে যেদিন মদ সম্পূর্ণ হারাম করা হলো, সেদিন থেকে কোনো মুসলমান মদ স্পর্শ করেনি। যেদিন মুসলিম নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হলো, সেদিন থেকে কোনো মুসলিম নারীকে প্রকাশ্যে ময়দানে বেপর্দায় দেখা যায়নি। তারা আল্লাহর নির্দেশমতো পর্দা করে বাইরের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

যেদিন ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হলো এবং গরীবদের মাঝে তা বণ্টনের নির্দেশ এল, সেদিন থেকে নবী করীম (স)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবের মাঝে তা বণ্টন করতে লাগলেন। কুরআন মাজীদে ধনী মুসলমান সম্প্রদায়কেও স্বেচ্ছায় যাকাত আদায় না করার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হলো। কুরআন মাজীদে ঘোষণা দেওয়া হলো

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى به بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . هَذَا مَا تكْبِزُون . كَفَرْتُمْ أَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَ َ

আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। একদিন আসবে, যখন এসব (সোনা-রুপাকে) দোযখের আগুনে গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্ব ও পিঠে সেঁকা দেওয়া হবে- এটাই ঐ ধন-সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। এখন নিজেদের জমানো ধন-দৌলতের স্বাদ গ্রহণ কর।' (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)

নবী করীম (স)-এর ইসলামী আন্দোলনে আমরা মুসলিম নারীদেরকে সমভাবে অংশীদার দেখেছি। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী নওমুসলিমদের ১৪ জনের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন নারী। দ্বিতীয়বার হিজরতকারী ৭০ জন মুসলমানের মধ্যে ১১ জনই ছিলেন নারী। কুরাইশ বংশের ধনবতী মহিলা বিবি খাদীজা (রা) নবী করীম (স)-এর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলামী আন্দোলনে নওমুসলিমদের সাহায্যে ব্যয় করেন। ধনী ব্যবসায়ী আবু বকর, ওসমান, ওমর (রা)-এর সমস্ত সম্পদ অসহায় নওমুসলিমের হিজরতে, পুনর্বাসনে, বিরোধীদের মোকাবেলায় যেমন ব্যয় হয়েছে, তেমনি মুসলিম নারীরাও তাদের অর্থ, সম্পদ ব্যয় করেছেন। বাতিল শক্তির মোকাবেলায় মুসলিম পুরুষদের সঙ্গে মুসলিম নারীরাও যুদ্ধের ময়দানে অংশ নিয়েছেন। মুসলিম নারীরা যুদ্ধরত সৈনিকদের ক্যাম্প পাহারা দিয়েছেন, আহত সৈনিকদের কাঁধে করে মদীনায় স্থানান্তর করেছেন, প্রয়োজনে অস্ত্র ধরেছেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইসলাম মায়ের জাত নারীকে দিয়ে অস্ত্র ধরার কাজ করায়নি। শুধু নারীকে তার ইজ্জত এবং জীবন রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণের অনুমতি দিয়েছে। মুসলিম নারীরা প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, সেখানে জরুরি অবস্থায় তারা নেকাব ফেলে মুসলিম সৈনিকের সাহায্য করেছেন; কিন্তু সুস্থ পরিবেশে তারা সেসব সৈনিকদের সামনে পর্দা রক্ষা করে চলেছেন। বিবি আয়েশা (রা) পর্দার আড়াল থেকে পুরুষ সাহাবীদেরকেও হাদীস শিক্ষা দিতেন। মুসলিম নারীরা পুরুষদের সঙ্গে হজ্জে গমন করেছেন। জামাআতে সালাত আদায় করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রযোজন যে, মুসলিম নারীরা শুধু ইশার জামাআতে এবং ফজরের জামাআতে অংশগ্রহণ করতেন এবং ফজরের জামাআত সেরে নারীরা অন্ধকার থাকতেই চলে যেতেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখন তাদের চেনা যেত না। জুমুআর জামাআত এবং ঈদের জামাআতেও নারীরা শামিল হতেন। এভাবে ইসলামের নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে মুসলিম নারীরা ইসলামী সমাজ গঠনে সমভাবে অংশ নিয়েছেন।

ইসলামী সমাজ গঠনের দায়িত্ব মুসলিম নারী-পুরুষের উভয়ের উপর আল্লাহ তাআলা ন্যস্ত করেছেন। কুরআন মাজীদে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكوة وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ،

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْصَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العظيم.

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের হুকুম দেয়, মন্দ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে। এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর অবশ্যই আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে এমন বাগান দান করবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে এবং যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ঐ চির সবুজ বাগানে তাদের থাকার জন্য পাক-পবিত্র জায়গা থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে- এটাই বড় সফলতা।' (সূরা তাওবা: ৭১-৭২)

ঘ. চিকিৎসায়

ইসলামের প্রথম যুগে নবীজি (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে নারীরা অসুস্থদের সেবা ও সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। সে সময় নার্সিংবিদ্যায় নারীদের বিশেষ অবদানও ছিল উল্লেখযোগ্য। নারী গবেষক ড. জান রাফাত 'ইসলামের ইতিহাসে চিকিৎসাবিদ্যা' নামক প্রবন্ধে ইসলামের সর্ব প্রথম নার্স সাহাবি রুফাইদা আল-আসলামি সম্পর্কে লিখেন, রুফাইদা (রা.)-এর পিতা ছিলেন সাআদ আল-আসলামি। যিনি নবুওয়তের ১১তম সালে মদিনা মুনাওয়ারার একমাত্র দক্ষ ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন।

নারী সাহাবিরা যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি লাভের পর যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্তদের সেবা করতেন। মশক ভরে পানি আনতেন। আহতদের পানি পান করাতেন, ছাতু গুলিয়ে দিতেন, তীর উঠিয়ে দিতেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করতেন। এ ছাড়া মালপত্র ও সাওয়ারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সবার খাবার তৈরির কাজও করতেন।

সমাজসেবায় পর্দা রক্ষা করে মহিলাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে হজরত রুফাইদা (রা.)-এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রহ.) থেকে

বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধের দিন সাআদ (রা.)-এর চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে রুফাইদা নামক এক মহিলার কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো। তিনি আহতের চিকিৎসা করতেন। নবী (সা.) সকাল-সন্ধ্যায় সাআদ (রা.)-এর কাছ দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার দিন কেমন কাটল, তোমার রাত কেমন কাটল? তিনি তাঁকে (নিজ অবস্থা) অবহিত করতেন। (আদবুল মুফরাদ, হাদিস : ১১৩৯)

তা ছাড়া খাইবার যুদ্ধে আহত মুসলিম মুজাহিদদের সুস্থ করতে তিনি মাতৃত্বের মমতাময়ী হাত বাড়িয়ে দেন।

তাঁর এই অবিস্মরণীয় ত্যাগ এবং সেবা-শুশ্রূষার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসুল (সা.) পুরুষ মুজাহিদদের সঙ্গে তাঁকেও গণিমতের মালের অংশ দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া নবী (সা.)-এর যুগে যেসব নারী নার্সিং ও সেবাদানে নিয়োজিত ছিলেন তাদের মধ্যে হজরত উম্মে আতিয়াহ আল আনসারি (রা.) অন্যতম। মহীয়সী এই নারী রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সেখানে যুদ্ধাহত সাহাবায়ে কেরামদের সেবা করতেন। অর্থাৎ নার্সের দায়িত্ব পালন করতেন। সে সময়ের ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করে বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের সাওয়ারি ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পশ্চাতে থাকতাম, তাঁদের খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশোনা করতাম।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৮৫৬)

ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ আরেক নার্সিং সাহাবির নাম উম্মে সুলাইম (রা.)। যুদ্ধাহত সাহাবায়ে কেরামকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য তিনি ওহুদ, খায়বার ও হুনাইন ছাড়াও উম্মে সুলাইম (রা.) অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মশক ভরে পানি আনতেন। আহতদের পানি পান করাতেন, ছাতু গুলিয়ে দিতেন, তীর উঠিয়ে দিতেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মে সুলাইমকে এবং কিছুসংখ্যক আনসার মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। তাঁরা মুজাহিদদের পানি সরবরাহ করতেন এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৫৩১)

অন্য বর্ণনায় আনাস (রা.) থেকে উহুদ যুদ্ধের এক দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত আছে, আবু তালহা বলেন, আমি সেদিন আবু বকরের কন্যা আয়েশা ও উম্মে সুলাইমকে এমন অবস্থায় দেখেছি, তাঁরা তাঁদের পিঠে পানির মশক বয়ে আনছিলেন। তখন তাঁরা এমনভাবে কাপড় গুছিয়ে চলছিলেন যে আমি তাদের পায়ে পরিহিত অলংকার দেখতে

পাচ্ছিলাম। তাঁরা আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তাঁরা আবার গিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে পানি দিচ্ছিলেন। (মুসলিম, হাদিস : ৪৫৭৭)
নবীজি (সা.)-এর চিরশত্রু আবু জাহেলের হত্যাকারী মুআউয়াজ (রা.)-এর কন্যা রুবাইয়িও ছিলেন নার্স সাহাবিদের অন্যতম। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী (সা.)-এর সঙ্গে থেকে লোকদের পানি পান করতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদিনায় পাঠাতাম।' (বুখারি, হাদিস : ২৮৮২)

ঙ. জিহাদে

রাসুলে যুগে নারী সাহাবারাও জিহাদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। তারা নিজে জিহাদে অংশ নিয়েছের শত্রুদের বিরুদ্ধে। তাঁরা স্বামিকে জিহাদে যাবার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। হাজার নারী সাহাবী শহিদের জননী হয়েছেন। নিজে শহীদ হয়েছেন।

**উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা যখন প্রায় বিজয় অর্জন করে ফেলেছেন ঠিক তখনই তীরন্দাজদের একটি ভুলের কারণে নেমে আসে মারাত্মক বিপর্যয়। শুরু হয় ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির। শত্রুবাহিনী রাসূল ﷺ এর একেবারে কাছে চলে আসে। সেসময় রাসূল ﷺ এর পাশে ছিল হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন সাহাবী।
সেসময় **নুসাইবাহ বিনতে কাব** অন্যান্য মহিলা সাহাবীর সাথে সৈন্যদের জন্য পানির মশক প্রস্তুত করছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন মুসলিমরা পরাজিত হতে যাচ্ছে এবং শত্রুদল রাসূল ﷺ কে আক্রমণ করেছে। তিনি এক মহূর্তও দেরী করলেন না। ফেলে দিলেন তাঁর কাঁধ থেকে পানির মশক। তুলে নিলেন এক হাতে ঢাল অন্য হাতে তরবারী। ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদলের মধ্যে। লিপ্ত হলেন ভীষণ যুদ্ধে। অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে থাকলেন।
তাঁর যুদ্ধের ক্ষীপ্রতা এতটাই বেশি ছিল যে স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি যেদিকে তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই নুসাইবাহকে দেখছিলাম সে আমাকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছে!
যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তখন তিনি সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে জানতে চান (যে তিনি সুস্থ আছেন কিনা)।

♣ নুসাইবাহ বিনতে কাব ছিলেন আনসারী মহিলা সাহাবী। তিনি উম্মে 'উমারাহ নামেও পরিচিত। দ্বিতীয় আকাবায় তিনি তাঁর পরিবারসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরপরই নুসাইবাহ নিজেকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ইসলামের জন্য প্রস্তুত করে নেন। ধনুর্বিদ্যা, ঘোড়সওয়ার তরবারী চালনাসহ বিভিন্ন যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী ছিলেন তিনি। উহুদ যুদ্ধ ছাড়াও খায়বার, হুনাইন, ইয়ামামার যুদ্ধে নুসাইবাহ উপস্থিত ছিলেন।

[সূত্র : Great Women of Islam; Darussalam, আর-রাহীকুল মাখতুম।]

উমাইয়া বিনতে কাইস। গিফারি গোত্রের এক মহিলা। তিনি এক মজলিসে খাইবার যুদ্ধে নিজের অংশগ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, গিফার গোত্রের কিছু মহিলাসহ আমি রাসুলের দরবারে উপস্থিত হই। আমরা সমবেত কণ্ঠে বলি, আমরাও আপনার সঙ্গে লড়তে চাই এবং নিজেদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী মুজাহিদদের সাহায্য করতে চাই। তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। পথে আমার ঋতুস্রাব হয়। রাসুল (সা.) আমাকে লবণমিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করার নির্দেশ দেন। খাইবার গিরিপথ বিজয়ের পর আমাকে গনিমতের অংশ দেওয়া হয়।

এ কথা বলে তিনি নিজের গলার হার ধরে বলেন, এই যে হার আপনারা দেখছেন; এটি রাসুল (সা.) আমাকে দিয়েছেন। তিনি নিজ পবিত্র হাতে আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন। রবের শপথ এ হার আমার গলা থেকে কোনোদিন পৃথক হবে না। তিনি আমৃত্যু এ হার গলায় রেখেছেন। মৃত্যুর আগে যেন এ হারসহ তাকে কবরে দাফন করার অসিয়ত করেন। (ইবনে সাদ তবকাত)

***উম্মে আয়মন হাবশি (রা.) ওহুদ, হুনাইন, খায়বর ও মোতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উম্মে সুলাইম (রা.) খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ইসলামের প্রথম নারী নৌযোদ্ধা। রাবি বিনতে মুয়াওয়াজ (রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নাসিবাহ বিনতে কাব আনসারিয়া ওহুদ, বনি কুরাইজা, হুদায়বিয়া, খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (সূত্র : তাবকাতে ইবনে সাদ : ৮/৪১৫; দালায়িলুন নবুয়্যাহ : ২/৭১২

♣ এইভাবে আমাদের নারী সাহারা নবিﷺ এর জন্য, দ্বীনের জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধাবোধ করেননি

** উম্মে আম্মার সুমাইয়াহ বিনতে খাইয়াত ছিলেন আবু জাহেলের দাসী। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটলে তিনি স্বামী-সন্তানসহ স্বপরিবারে ইসলাম কবুল করেন। তখন আবু জাহেলের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি নেমে আসে ভয়াবহ নির্মমতা, প্রচণ্ড জুলুম নির্যাতন। সে তাদেরকে অগ্নিঝরা রোধে বেঁধে রাখত। ফলে গরমের তীব্রতা ও পিপাসায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেতো। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। পিপাসায় ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে এবং তাদের পুরো শরীরে বেত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। আর উপর থেকে সূর্যের তাপ তাদেরকে ঝলসে দিচ্ছে। তাদের এই করুণ দৃশ্য দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। বললেন, “ধৈর্য ধরো হে ইয়াসরিবের পরিবার, তোমাদের ঠিকানা হলো জান্নাত।" এ বাক্যগুলো কানে পৌঁছামাত্র তাদের হৃদয় আনন্দে নেচে উঠলো। সুসংবাদের আনন্দে তাদের হৃদয় আত্মহারা হয়ে গেলো।এদিকে হঠাৎ আবু জাহেলের আবির্ভাব ঘটলো। সে ক্রোধে হিংস্র মূর্তি ধারণ করে তাদের উপর চড়াও হলো। তাদেরকে বলল, তোমরা মুহাম্মাদ ও তাঁর প্রভুকে গালি দাও। কিন্তু আজ তারা প্রভুর একত্ববাদের দাবিতে আরো অটল, আরো অবিচল। এদিকে এ নরাধম পশুর ন্যায় হযরত সুমাইয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এখানেই শেষ নয়, সে নির্মমভাবে বর্শা দ্বারা তার লজ্জাস্থানে সজোরে আঘাত করল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলো। তিনি চিৎকার দিয়ে সাহায্য কামনা করলেন। তার উপর এমন নিষ্ঠুর নির্যাতনের দৃশ্য তার স্বামী-সন্তান দুপাশে বাঁধা অবস্থায় অসহায়ভাবে দেখলেন। ধূর্ত শয়তান আবু জাহেল তাকে গালিগালাজ ও নির্যাতন করতে থাকল। তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতেলাগলেন, দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)। তখন আবু জাহেল নির্মমভাবে বর্শা দ্বারা তার শরীরে আঘাত করতে করতে তার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগুলো টুকরো টুকরো ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল। সুমাইয়াহ (রাযি.) শাহাদাত বরণ করলেন।
(সূত্র : হে আমার মুসলিম বোন:Dr.Sheikh Muhammad Bin Abdur Rahman Arifi)

**উম্মে সুলাইম ছিলেন খাঁটি ও মজবুত ঈমানের অধিকারিনী পাক্কা মুমিন নারী, তীক্ষ্মতা ও দুরদর্শিতা সম্পন্ন একজন বুদ্ধিমতি নারী, সর্বোত্তম শ্রেণীর একজন স্ত্রী, একজন আদর্শ মা, এসব কিছুর উর্ধ্বে ছিল এই যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর পথে সংগ্রামী এক অকুতোভয় নারী। যুদ্ধক্ষেত্রের কতনা ধূলা তাঁর দুই শ্বাসযন্ত্রে (নাকে) ঢুকেছে! আহত মুজাহিদদের রক্ত মুছতে গিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে গিয়ে কতবারই না রাঙা হয়ে উঠেছে তাঁর দু'হাতের আঙুলগুলো কতবার আল্লাহর পথে প্রাণদানকারীদের পিপাসার্ত কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন সুপেয় পানি তুলে দিয়েছেন তাদের সামান মেরামত করেছেন তাদের তির আর ধনুক।

'ওহোদ' যুদ্ধে তিনি ও তাঁর স্বামী আবু তালহা শরীক হয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সালাম এর সঙ্গে, সেখানে তিনি ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা পানির মশক পিঠে নিয়ে ময়দানে ছুটে বেরিয়েছেন আর আহত ও তৃষ্ণার্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি শরিক হয়েছেন **'হুনাইনের'** যুদ্ধেও। সেদিন তিনি (যোদ্ধার মত) হাতে নিয়ে ঘুরছিলেন একটি খঞ্জর (ছুরি), তাঁর স্বামী আবু তালহা অবস্থা দেখে রাসূলের নিকট গিয়ে বললেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ! উম্মে সুলাইমকে দেখুন, খঞ্জর হাতে নিয়ে ঘুরছে। নবীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

এটা কী উম্মে সুলাইম?

-একটি খঞ্জর, এটা নিয়ে এসেছি কারণ কোন মুশরিক যদি আমার কাছাকাছি এসে পড়ে তাহলে এটা দিয়ে তার পেট ফেঁড়ে ফেলব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব শুনে হাসতে লাগলেন।

(সূত্র : নারীদের ঈমানদীপ্ত জীবন:ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

♣ উম্মে সুলাইমের যুদ্ধে অংশগ্রহণ দেখুন,সাথে তিনি খঞ্জর নিয়ে আসছেন যাতে শত্রুর কাছে তিনি পরাজিত না হন। এটাই ছিলো নবি(সা) এর যুগের নারীদের ঈমান। নিজে শহীদ হবো তবুও শত্রুকে জিততে দিবো না]

♣আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা পরাজিত হয়ে নবী সা. এর নিকট থেকে দূরে সরে পড়ল আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমকে দেখলাম, তারা তাদের পরিধেয় বস্ত্রের পায়ের নীচের দিকের প্রান্ত

টেনে তুলে পিঠে করে মশক ভর্তি পানি এনে লোকদেরকে ঢেলে ঢেলে পান করাচ্ছেন এবং পুনরায় গিয়ে ভরে এনে পান করাচ্ছেন।" (আস-সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ: মেয়েদের যুদ্ধাভিযান ও পুরুষদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, হাদীস নং-২৮৮০, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৩)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে "রুবাই বিনতে মু'আব্বিষ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমরা নবী সা. এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে থাকতাম। আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-যত্ন করতাম.........। (আস-সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ: নারী কর্তৃক যুদ্ধের ময়দানে পুরুষদের চিকিৎসা করা, হাদীস নং-২৮৮২, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৪)

♣ এইভাবে একজন সেবিকা ও জরুরত প্রয়োজন হিসেবে আমাদের নারী সাহাবারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন।

–বুখারী শরীফে আছে, "রুবাই বিনতে মু'আব্বিষ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমরা নবী সা. এর সাথে রণাঙ্গনে থাকতাম। আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং আহত ও নিহতদের (মদীনায়) ফেরত পাঠাতাম(আস-সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ: মেয়েরা আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠাতো, হাদীস নং-২৮৮৩, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৪)
উম্মে আতিয়্যাহ আল আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের সাওয়ারি ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পশ্চাতে থাকতাম, তাদের খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশোনা করতাম।(’ সহিহ মুসলিম)

চ.রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।
রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে উম্মূল মু’মিনীন

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর সিদ্ধান্তকে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমোদন করতেন। তিনি মহিলা বিষয়ক কোনো কোনো সরকারি কাজের দায়িত্ব শিফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে দিতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।[ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন[14]। আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।[ইবনে কাইয়ুম জাওজিয়া, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।]

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।[ইবনে হাজার আস কালানী, ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭]

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা

বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা, উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ যথাক্রমে পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, করীমা বিনতে আল্‌-মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।[আবুল হাসান আল্‌-বালাযুরী, ফতহুল বুলদান, (কায়রো, বৈরূত, দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।]

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মূল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা এর মত প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।[ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫।]

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবন্‌ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা -এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায়

কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।[জালালুদ্দীন উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।]

ছ.সাক্ষ্যদান ও বিচার কাজে

সাক্ষ্যদান ও বিচার কাজে নারীর অংশগ্রহণ ইসলামে বৈধ। মহান আল্লাহর বাণী,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

" তোমাদের মধ্য থেকে দুজন পুরুষকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানিয়ে নাও। যদি দুজন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে সাক্ষী বানাও, যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন লোক সাক্ষী হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। "

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: (অপবাদের ঘটনা প্রসংগে) তিনি বলেছেন, যখন আমার সম্পর্কে যা কিছু বলার তা বলা হয়েছিল.... রাসূল সা. আমার ঘরে আসলেন এবং আমার কাজের মেয়েকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আল্লাহর কসম। আমি তাঁর সম্পর্কে এছাড়া খারাপ আর কিছুই জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন আর বকরী এসে আটার খামির খেয়ে ফেলতো। তাঁর কোনও সাহাবা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসুল সা. এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তারা তার কাছে অপবাদের ঘটনা খুলে বললো। তখন সে বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম!! একজন স্বর্ণকার তার খাঁটি স্বর্ণখণ্ড পরীক্ষা করে যা জানে আমিও তার সম্পর্কে ততটুকুই জানি। "

জ. দ্বীনের খাদিমাহ হিসেবে

আমাদের প্রিয় নবি ﷺ আমাদের ইসলামের দাওয়াহ দিয়ে গেছেন, ইসলামকে আঁকড়ে ধরা শিখিয়েন।আচারণে- উচ্চারণে আখলাক ও চরিত্রগুনে, নীতি ও আর্দশে তিনি ছিলেন সর্বযুগের মানুষের জন্য অনুকরনীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি আর আমৃত্যু জীবনদশায় আমাদের মাঝে দাওয়াহ দিয়েছেন। তার এই দাওয়াহ কাজে সহযোগী

হয়ে ওঠেছিলেন তার সাহাবা গণ। সাহাবাগণের পাশাপাশি নারী সাহাবিগণের গুরুত্ব অপরিসীম। দাওয়াহ কাজে,সমাজ গঠন কাজে, জিহাদে, জিহাদে আহত সাহাবিদের সেবা হিসেবে একজন নার্স হিসেবে চিকিৎসা করা, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে কখনো স্বামি, সন্তানকে অনুপ্রেরণা দিয়ে আবার কখনো কখনো নারী সাহাবিরা নিজেই জিহাদের ময়দা উপস্থিত হয়েছেন শত্রুদের দমন করতে। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই ইসলামে নারীদের একটি সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

“নবিজী ﷺ যখন মাদীনায় স্থির হন নি এর মধ্যে চলে এলেন আনাস ইবনে মালেক রদ্বিআল্লহু আনহুর মা গুমাইসা বিনতে মিলহান রদ্বিআল্লহু আনহা নবিজীকে ﷺ সালাম দিয়ে বললেন -
'ইয়া রসূলাল্লহ! আনসারের প্রতিটি নারী-পুরুষ আপনাকে দিয়েছেন কিছু না কিছু হাদিয়া। কিন্তু আমার কাছে আপনাকে দেওয়ার মত যে কিছুই নেই এই পুত্রটি ছাড়া! দয়া করে একেই গ্রহণ করুন। আপনার খেদমতের জন্য এঁকে দিয়ে গেলাম।'

সাহাবাদের জামায় নারীদের ভূমিকা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। একইভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতেও পুরুষদের সাথে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকত। আয়েযা নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন,

''আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্যে থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখী হবে সে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।''[দারেমী, সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২]
ফলে পূর্বে যে নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোনো অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

#খাওলা বিনতে আজওয়ার (রা.) ছিলেন একজন প্রতিভাবান কবি ও সাহসী যোদ্ধা। সাহসিকতা ও বীরত্বে যাকে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।আসাদ গোত্রের এই কন্যারূপে ও গুণে, জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অদ্বিতীয়।
খাওলা (রা.) ছিলেন আরবের ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় পরিবারের সন্তান। বীরত্ব ও সাহসিকতায় যুগ যুগ ধরে তাঁর পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। ফলে পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তিনি জ্ঞান ও সমরবিদ্যা চর্চার সুযোগ পান। ইসলাম গ্রহণের পর তার পুরো পরিবার ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে।
খাওলা বিনতে আজওয়ার (রা.)-এর ভাই দিরার (রা.) বৃহত্তর শাম তথা বর্তমান সিরিয়া, জর্দান ও ফিলিস্তিন অঞ্চল জয়ে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভাইয়ের সঙ্গে তিনিও বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধ তার একটি। এই যুদ্ধের চতুর্থ দিনে বাইজানটাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি একদল নারীর নেতৃত্ব দেন এবং এ যুদ্ধেই তিনি এক গ্রিক যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করে বাইজানটাইন সৈন্যদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

৬৩৪ সালে 'সানিতা-উল-উকাব' (দামেস্কাস ঘেরাওয়ের সময় সংঘটিত যুদ্ধ) যুদ্ধে তিনি প্রথম প্রতিভার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে তাঁর ভাই দিরার মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি আহত হন এবং বাইজানটাইন বাহিনীর দ্বারা বন্দি হন। এ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাঁর বিশেষ টহল দল দিরারকে উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তার আগেই খাওলা (রা.) মুসলিম বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে পাল্টা আক্রমণ করেন।

সেদিন তিনি এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন যে যতক্ষণ না খালিদ (রা.) এসে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ বহু মুসলিম সৈন্য খাওলা (রা.)-কেই খালিদ ভাবছিলেন। অবশেষে শত্রু বাহিনী পরাজিত এবং পালিয়ে যায়। তিনি তাঁর ভাইকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। যুদ্ধশেষে খালিদ খাওলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় খুঁজে পান এবং তাঁর পরিচয় জানতে চান। প্রথমে অসম্মতি জানালেও শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। সেনাপতি শুরাহবিল ইবনে হাসানা খাওলা (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এই যোদ্ধা খালিদ বিন ওয়ালিদের মতোই যুদ্ধ করে; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সে খালিদ নয়। '

অন্য একটি যুদ্ধে খাওলা (রা.) রোমানদের হাতে বন্দি হন। তাঁকে অন্য বন্দিদের সঙ্গে শত্রুদের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাঁকে রোমান সেনাপতির তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তখন তিনি অন্য বন্দি নারীদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। নারী বন্দিরা তাঁবুর খুঁটিগুলো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে রোমান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করলেন। আল ওয়াকিদির মতে, তাঁরা ৩০ জন রোমান সেনাকে হত্যা করেন। এক খ্রিস্টান অধিনায়ক খাওলা (রা.)-কে বন্দি অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি তাকেসহ মোট পাঁচজন সেনাকে একাই হত্যা করেন।উল্লেখ্য, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ২৮ জন নারী সাহাবির নাম ছিল খাওলা। ফলে খাওলা বিনতে আজওয়ার (রা.)-এর পরিচয় নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের ভেতর কিছুটা মতভিন্নতা আছে। কিন্তু গবেষক আইমান জাগুল আল্লামা ওয়াকেদি, আল্লামা ইবনে কাসির ও আল্লামা জারকানি (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করেছেন, বীরাঙ্গনা সাহাবি খাওলা বিনতে আজওয়ার ছিলেন সেনাপতি দিরার বিন আজওয়ার (রা.)-এর বোন। আর তিনিই তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।(*তথ্যসূত্র : আল-মারয়াতুল আরাবিয়্যা ফি জাহিলিয়্যাতিহা ওয়া ইসলামিহা, পৃষ্ঠা ৯৬; মাউদু ডটকম ও উইকিপিডিয়া)*

**আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

‘‘আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নি। ।[হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি., পৃ.২৭।]
আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা -এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।[জালালুদ্দীন উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।]

**মূসা ইবন্ তালহা বলেনঃ

‘‘আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখি নি।’’[ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, আল্ ইসাবা ফী তামীযিস্ সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।]
লোকেরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে বিস্মিত হতো। ইবনে আবী মূলায়কা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মীতা দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ আপনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কন্যা। আর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বাগ্মীতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কিভাবে শিখেছেন? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[হাকেম, মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।]

ফারায়েযের অংক শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[তদেব]

'আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইবনে ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

''আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান আনসারী বিজ্ঞ ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অতএব, তাঁর নিকট থেকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতিশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গৃহীত হতো।[ইবনে ইমাদ হব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫৫।]

''তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।''[ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।]

তাবেঈদের জামানায় নারীদের ভূমিকা

পরিবার গঠনে

পরিবার গঠনে রবীআ (রহ) এর ভূমিকা;

**হযরত আদুল ওয়াহহাব ইবনে আতা রহ. বলেন, রবীআর পিতা আবু আবদুর রহমান। যার আসল নাম ফররুখ-বনু উমাইয়ার শাসনামলে একজন সৈনিক হিসেবে খোরাসানের যুদ্ধে যান। রবীআ তখন তার মায়ের গর্ভে ছিলেন। যাওয়ার সময় উম্মে রবীআর নিকট ত্রিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) রেখে যান। সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। পিতা ফররুখ ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর পুত্র রবীআর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ-ই আমার ছেলে? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি

স্ত্রীকে বললেন, যাওয়ার সময় তোমার কাছে যে সম্পদ (দীনার) রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো বের করে দাও। স্ত্রী বললেন, এগুলো আমি সংরক্ষণ করেছি। এখনই তা জানতে পারবেন।

তারপর পুত্র রবীআ মসজিদে গমন করলেন। যথারীতি তার মজলিসে গিয়ে বসলেন। ইমাম মালেক, হাসান ইবনে যায়দ, ইবনু আবু আলী লাহাবী ও মদীনার অন্যান্য গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। উম্মে রবীআ স্বামীকে বললেন, যান, মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায পড়ে আসেন। তিনি মসজিদে এসে নামায পড়লেন। অতঃপর লোকজনে ভরপুর মজলিসের দিকে তার নজর পড়লো। তিনি সেখানে গিয়ে বসলেন। তারা তার জন্য একটু জায়গা প্রশস্ত করে দিলেন। রবীআ এমনভাবে মাথানত করে রাখলেন, যেন তিনি তাকে (পিতা) দেখেননি। তার দেহ চাদর আবৃত ছিলো। পিতা ফররুখ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আল্লাহ তাআলা সন্তানকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

তারপর পিতা ঘরে ফিরে গেলেন এবং ছেলের মাকে বললেন, আজ তোমার ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলাম, যে অবস্থানে কোনো আলেম বা মুফতীকে দেখতে পাইনি। উত্তরে তার আম্মা বললেন, এবার বলুন, আপনার নিকট কোনটি বেশি প্রিয়-ত্রিশ হাজার দীনার, নাকি সন্তানের এই উচ্চ মর্যাদা। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! সন্তানের এই মর্যাদাই আমার কাছে প্রিয়। উম্মে রবীআ বললেন, আপনার রেখে যাওয়া সব দীনার তার জন্যই ব্যয় করেছি। পিতা বললেন,

আল্লাহর কসম! তুমি তা অনর্থক কাজে নষ্ট করনি। (তারতীবুল মাদারিক ১/১১৯;)

উম্মু রবীআ কিন্তু পয়সা গুলা নিজের স্বার্থে ও নিজের অতীব প্রয়োজনে খরচ করতে পারতেন যেহেতু সবাই ভেবেছিল তার স্বামি আর ফেরত আসবে না। কিন্তু তা করেননি তিনি। তিনি এসব পয়সা নিজের স্বার্থে খরচ না করে,সন্তানকে একজন যোগ্য সম্পদে গঠে তুলেছিলেন সেই দীনার দিয়ে। তার সন্তান এমন এক সম্পদ যা এই দীনার এর থেকেও মূল্যবাদ,দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য। কত সুন্দর উম্মু রাবীআ তার সন্তানকে প্যারেন্টিং দান করেছেন,সুবহানাহআল্লাহ।

***উম্মে মালেক ইবনে আনাস : ইমাম মালেক রহ. তখন কিশোর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাই তার গান শেখার ইচ্ছে হল। মাকে গান শেখার কথা বললেন। তাঁর আম্মা তাকে বললেন যে, তুমি তো গায়কদের মতো সুন্দর নও।

গায়ক যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং তুমি গানের চিন্তা বাদ দিয়ে ফিকহ অর্জন কর। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তখন আমি গায়কদের পরিত্যাগ করে ফুকাহাদের অনুসরণ করলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মা তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিলেন এবং তার উপর ধবধবে সাদা একটি পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বললেন, যাও! এখন তুমি রবীআতুর রাঈ-এর মজলিসে গিয়ে বস। তার নিকট থেকে ইলম শেখার পূর্বে আদব শেখ। ইমাম মালেক তার সান্নিধ্যে থেকে ফিকহ ও হাদীস অর্জন করেন। তিনি বলতেন, রবীআর মৃত্যুর পর থেকে ফিকহের স্বাদ নিঃশেষ হয়ে গেছে।
(-তারতীবুল মাদারিক ১/১১৯;)

♣ এখানে দেখা যায় ইমাম মালেক ইবনে আনাসের যখন গায়ক হতে মন চাই তখন তার আম্মাকে বলেন সে গায়ক হবে এতে তার আম্মা ভিতরে অসন্তুষ্ট হলেও তাকে বকা দিয়ে বুঝায়নি বরং তাকে সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছে এবং ফিকহ পড়তে কতটা স্বাদ তা অনুধাবন করিয়েছেন। এইজন্য তিনি এতো ফিকহ ও হাদিস শিখতে পারছেন। তাঁকে হাদিস ও ফিকহ এর স্বাদ অর্জন শিখেয়েছেন।
***ইমাম শাফেয়ী (রহ:) এর মা
ইমাম শাফেঈ যখন মাতৃগর্ভে তখন তার মা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। মক্কায় তার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে বলে স্বপ্নে তাকে জানানো হয়েছিল। স্বপ্নের এ কথা সত্য হ'লে তা হবে আদব ও ইলমের পর ইমাম শাফেঈর মর্যাদাশালী হওয়ার তৃতীয় কারণ।*[তাহযীবুয তাহযীব ৯/২৬]*
কুরআন হিফযের প্রতি তার মা প্রথমেই গুরুত্ব দেন। ফলে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি হাদীস শেখায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ইমাম মালেক সংকলিত মু'আত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করে নেন। তারপর তিনি মক্কায় ইলম অন্বেষণে মশগুল হন এবং শারঈ বিদ্যায় এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে বিশ বছর না হ'তে তিনি ফততুয়া দানের অনুমতি লাভ করেন।*[আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহু, পৃ ৩১।]*

তার এ অর্জনের পিছনে মহীয়সী মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। জীবন গড়ার সঠিক পথ মা যেমন জেনেছেন তেমনি ছেলেকে তিনি সে পথে তুলে দিয়েছেন। ছেলে যাতে

নির্দেশিত পথ আঁকড়ে থাকে, কোনভাবে বিচ্যুত না হয় সে বিষয়ে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। মায়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাকে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে নিশ্চয়ই পথ দেখিয়েছে।

হয়তো এই মা নিজেও তৎকালীন প্রচলিত কিছু ইলম আয়ত্ব করেছিলেন। সে যুগে খুব কম মহিলাই ছিলেন যারা জ্ঞানের দৌলত থেকে শূন্য ছিলেন। তার জ্ঞান-গরিমার সমর্থনে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মক্কা মুয়ায্যামার কাযীর আদালতে এক মোকদ্দমায় তিনি ও আরেকজন মহিলা সাক্ষ্য দিতে হাযির হন। কাজী পরীক্ষাস্বরূপ দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তখন ইমাম শাফেঈর মা তাকে বলেন, আপনার সে অধিকার নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى 'দু'জনের একজন যদি ভুলে যায় তবে তাদের একজন অন্যজনকে মনে করিয়ে দেবে' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। তার কথায় বিচারক নীরব হয়ে যান।[*ই'লাউস সুনান ১৫/৩০৮।]*

***শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) শারঈ ইলমে অত্যুচ্চ আসনে আসীন হয়েছিলেন। হাফেয ইবনু রজব বলেন, তার আলোচনা যতই করা হোক না কেন তা বাহুল্য হবে না এবং তার কার্যাবলীর বর্ণনা যে ভাষাতেই করা হোক তা কোন বাড়-বাড়ন্ত হবে না। তার এই উঁচু মর্যাদার পিছনে তাঁর মায়ের বড় অবদান ছিল।শায়খুল ইসলাম একসময় মিশরে আর তার মা শামে অবস্থান করছিলেন। তখন মা ও ছেলের মধ্যে পত্র বিনিময় হ'ত। এমনি একটি পত্রে ছেলে ওযরখাহি করে মাকে লিখেন:

'আহমাদ বিন তায়মিয়ার পক্ষ থেকে আমার সৌভাগ্যবতী মায়ের প্রতি। মহান আল্লাহ তার অনুগ্রহ রাজি দিয়ে তার দু'চোখ শীতল করুন এবং তাকে তার শ্রেষ্ঠ দাসী ও সেবিকাদের একজন করুন।

সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি তোমার সমীপে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি সর্বশক্তিমান। আমি তাঁর কাছে মিনতি করি যে, তিনি যেন দয়া ও করুণা বর্ষণ করেন মুত্তাক্বীদের নেতা শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ পাক তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর অজস্র ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। তোমার নিকট আমার পত্র প্রেরণের সুযোগ আল্লাহ তা'আলার

এক মহা অনুগ্রহ, তাঁর অসীম দান এবং মোটা দাগের করুণা। সেজন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আমি তাঁর নিকট এ অনুগ্রহ বেশী বেশী কামনা করি। আল্লাহর অনুগ্রহ তো যখন আসে বেশী মাত্রায়ই আসে, তা গোনাগুনতির ধার ধারে না।

তোমার জানা আছে যে, এ মুহূর্তে আমার এ দেশে অবস্থান কেবলই দ্বীনের খেদমত ও এমন কিছু জরুরী কাজের স্বার্থে, যে কাজগুলো যতই আমাদের থেকে ছাড়া পড়বে ততই আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া বিগড়ে যাবে। আল্লাহর কসম! দূরত্বের কারণেই আমি তোমার কাছে ছুটে যেতে পারি না। পাখি যদি আমাকে বয়ে নিয়ে যেত তবে আমি তোমার কাছে উড়ে যেতাম। কিন্তু গায়েবের হাতেই তার বাগডোর। যদি তুমি আমার ভিতরের অবস্থা জানতে পারতে তবে এ মুহূর্তে কেবল সেই উড়ে আসা কামনা করতে। আমিও এই শহরে একটা মাসও বাস করতে চাইতাম না। আল্লাহরই সকল প্রশংসা।

আমি বরং প্রতিদিন আমার ও তোমার কল্যাণ চেয়ে আল্লাহর নিকট দো‘আ করছি, তুমিও আমার জন্য দো‘আ কর মা। আমরা সবাই মহান আল্লাহর নিকট দো‘আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখেন। আল্লাহ তা‘আলা যে আমাদের জন্য তাঁর রহমত, বরকত ও হেদায়াতের কত দরজা খুলে রেখেছেন তার ইয়ত্তা আমরা করতে পারি না, আমাদের মনেও তাঁর ছবি ভেসে ওঠে না।

আমরা সর্বদাই সফর নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি, আমাদের সব কিছু যাতে কল্যাণকর হয় সেজন্য আল্লাহর দরবারে মিনতি করছি। তাই বলে কেউ যেন না ভাবে, আমি তোমার সান্নিধ্য থেকে পার্থিব অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমি তো বরং তোমার সান্নিধ্য থেকে উত্তম নয় এমন দ্বীনী কাজকেও প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু এখানে এমন কিছু বড় বিষয় রয়েছে, যা সম্পাদন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো বরবাদ হ’লে আমাদের ভয় হয় যে, তাতে আম-খাছ সব শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপস্থিত লোকেরা যা দেখতে পায় ও বুঝতে পারে অনুপস্থিত লোকেরা তা দেখতে ও বুঝতে পারে না। কল্যাণ লাভের জন্য বেশী বেশী দো‘আ প্রার্থনীয়। কেননা আল্লাহ জানেন, আমরা জানি না। আল্লাহ ক্ষমতা রাখেন, আমরা রাখি না। গায়েবের জ্ঞান একমাত্র তাঁর কাছে।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তোমাদের উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক বেশী বেশী মাত্রায়। শান্তি, দয়া ও মঙ্গল বর্ষিত হোক বাড়ির ছোট-বড় সকলের উপর এবং প্রতিবেশী, পরিবার-পরিজন ও সাথী-বন্ধুদের এক এক করে সকলের উপর। সকল প্রশংসা রাববুল আলামীনের জন্য। আল্লাহ তা'আলা করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর'।
[*মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৪৮।*]

এ পত্র লেখার প্রায় পঁচিশ বছর আগে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর পিতা ইমাম আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন তায়মিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মায়ের স্নেহ-ভালোবাসার ছায়াতলেই ইমাম ছাহেবের দিন গুযরান হ'তে থাকে। মায়ের প্রতি শায়খুল ইসলামের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যে কত প্রগাঢ় ছিল পত্রে তার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ মাকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন। কথায় ও কাজে মায়ের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব তুলে ধরতে তিনি ছিলেন অকৃপণ।

মা ও ছেলের মতো তীক্ষ্ণ ধী ও ক্ষুরধার বোধসম্পন্ন এবং দ্বীনদার মানুষ ছিলেন। ছেলেকে নিয়ে মায়ের ইচ্ছা ও মনোবাসনা যে কত ইখলাছ ও সততাপূর্ণ ছিল সে কথার আভাস মায়ের লেখা পত্রে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাই তো ছেলে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলতে পারছেন, তার মা রাববুল আলামীনের শরী'আতের চাওয়া-পাওয়ার বাইরে একদমই যাবেন না

শিক্ষায় ভূমিকা

তাবেয়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (র.) ইমাম যুহরীকে বললেনঃ আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, 'আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের মজলিস কখনো ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত। অতএব, তিনি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র.) বললেন, তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি 'আমরাহ্

বিনতে আব্দুর রহমানের খিদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।[*হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬]*

**জয়নব তবিবাতু বনি আউদ : তিনি জয়নব আশ-শামিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। উমাইয়া খলিফাদের স্ত্রীদের চিকিৎসা করতেন। অস্ত্রোপচার ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। (আত-তিব্ব ওয়া রাইদাতুহুল মুসলিমাত, পৃষ্ঠা ৯১)

** উম্মুদ দারদা রাহ.-এর পৈত্রিক নাম ছিল হুজাইমা। হুজাইমা বিনতে হুয়াই।
অল্প বয়সেই হুজাইমা রাহ. পুরো কুরআন আয়ত্ত করে ফেলেন। কুরআন শুদ্ধ করে পড়ার প্রতি ছিল তার অপরিসীম আগ্রহ। তিনি বলতেন, "কুরআন যেভাবে নাযিলে হয়েছে আমি ঠিক সেভাবে তিলাওয়াত করতে চাই।"
কুরআন শেখার পাশাপাশি হুজাইমা রাহ. আবুদ দারদা রা. থেকে প্রচুর হাদীসও শিখেছিলেন। হাদীসের প্রায় সবগুলো প্রসিদ্ধ কিতাবেই তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যতৎকালীন প্রায় সকল বড় বড় উলামায়ে কেরাম তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানও কখনো কখনো তার মজলিসে এসে উপস্থিত হতেন।হুজাইমা রাহ. আবুদ দারদা(রা) ছাড়া আরো বেশি কয়েকজন সাহাবি থেকে হাদীস শুনেছেন।[মাসিক আল কাউসার]

**ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই তিনি ছাত্রদের বলতেন:
ارجع فالغلط معك.

"তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।"[তদেব]

♣ মালিক(র) এর কন্যা শিক্ষায় কতটা জ্ঞানী ছিলেন যিনি পর্দার আড়াল থেকে তার বাবা তার শিষ্যদের কি পড়া শিখাচ্ছেন সব শিখতেন এবং তাদের কোথাও ভূল হলে করাঘাত করতেন।

***একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটি মাসআলা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়া'কুব নাম্নী বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেনঃ''আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসআলা বর্ণনা করলেন তা কোথাও পাইনি।''[মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭৮।]

**উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত দ্বীনের প্রচার ও ওয়াজ নসীহত করতেন।''[ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, আল্-ইসাবা, প্রাগুক্ত, ৩১৭।]

♣ দাসীরাও জ্ঞানচর্যায় পিছিয়ে থাকেননি।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে লিখেছেনঃ
''উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।''[ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, আল্-ইসাবা ফী তামীযি্ সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯]
উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার (র.) বলেনঃ
''তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।''[ইবনে আব্দিল বার, আল্ ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাত যায়নাব বিনতে আবূ সালামা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৫।]

ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। একটি ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত উমর এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর সাথে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে

পারেন নি। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন,

كانت من المهاجرات الأول ذات عقل وافر وكمال.

‘‘তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারিণীদের একজন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী ছিলেন।’’[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।]

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী। হাফিয ইবনে হাজার (র.) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

‘‘তাঁর মর্যাদা এবং গুণাবলী অনেক এবং সর্বজনবিদিত।’’[ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২]
তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন:

كانت من فاضلات الصحابيات .

‘‘তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন।’’[*ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।]*

উম্মে আতিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন:

وهي من فاضلات الصحابيات والغازيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

‘‘তিনি উচ্চ মর্যাদা ও জ্ঞানের অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছেন।’’[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।]

হাফসা বিনতে সিরীন উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। বার বছর বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন। তিনি বসরার বাসিন্দা ছিলেন। বসরার বিখ্যাত কাযী ও ফকীহ্ ইয়াস ইবনু মু‘আবিয়া তাঁর সম্পর্কে বলেন,

ما أدركت أحدا أفضِّلُ على حفصة.

“আমি এমন কোনো লোক দেখি নি, যাকে হাফসা বিনতে সিরীনের উপর মর্যাদা দিতে পারি।”[ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০।]

তাবিয়ীদের ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই তিনি তার উস্তাদ ইমাম সাঈদের মজলিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ইমাম সাঈদের কন্যা বললেন:

اجلس أعلمك علم سعيد.

“আপনি বসুন। ইমাম সাঈদ আপনাকে যা শেখাবেন তা আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব।”[*ইবনুল হাজ্জ, আল্-মাদখাল, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি., পৃ. ২১৫।]*

ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই তিনি ছাত্রদের বলতেন.

“তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।”[*তদেব]*

একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটি মাসআলা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়া‘কুব নাম্নী বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেনঃ“আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসআলা বর্ণনা করলেন তা কোথাও পাইনি।”[*মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭৮।*

**আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

“আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নি। ।[হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি., পৃ.২৭।]

তাবিয়ীদের ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই তিনি তার উস্তাদ ইমাম সাঈদের মজলিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ইমাম সাঈদের কন্যা বললেন:

اجلس أعلمك علم سعيد.

“আপনি বসুন। ইমাম সাঈদ আপনাকে যা শেখাবেন তা আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব।”[ইবনুল হাজ্জ, আল্-মাদখাল, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি., পৃ. ২১৫।]

বর্তমান জামানায় নারীদের অবস্থান

বর্তমান সময়ে নারীরা পশ্চিমাদের অনুসরন বেশি করে। এখনকার নারীরা মডারেট মুসলিমা। আমাদের রাসুলﷺ এর যুগে নারীরা দুনিয়া কম, আখিরাত খুজতো বেশি"। কিন্তু এখনকার নারীদের দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক বেশি এবং তারা মৃত্যু ও আখিরাত সব ভুলার পথে। আমাদের অবস্থা এখন এতো করুন যে আমরা মৃত্যু জিনিসটা শুধু মৃত্যুর সময় মনে করি। বর্তমানে আমাদের নারীদের মনে একবার মনে আসে না" আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে কিসের জন্য পাঠিয়েছেন?" আমাদের এখন জীবনের লক্ষ হয়ে হয়েছে দুনিয়া। আমাদের নারীরা এখন ব্যস্ত নিজেদের ক্যারিয়ার কিভাবে গড়বে, কিভাবে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে, কিভাবে দুনিয়াতে সাফল্য পাওয়া যায়।অথচ দুনিয়া তুচ্ছ বৈকি ছিলো না।

আমাদের বর্তমান নারীদের মধ্যে যে জিনিসগুল খুব খারাপভাবে ঢুকেছে তা হলো নারীবাদ, ট্র্যান্সজেন্ডার, পশ্চিমা সংস্কৃতি।নারীবাদী আন্দোলন দাজ্জালের অন্যতম ভাবাদর্শ।

নারীবাদী আন্দোলনে বলা হয় নারী ও পুরুষ একে অপরের সমান। ইসলামের মতে নারী ও পুরুষ একে অপরের সমানও নয় বা কেউ কারোর চেয়ে উত্তমও নয়। তারা একে অপরের পরিপূরক, অনেকটা একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠের মত। সূরা লাইলের ১ থেকে ৪ নং আয়াতে আল্লাহ কি বলেন দেখুন -

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

১। শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

২। শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

৩। এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى

৪। নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাত ও দিনের সপথ নিয়েছেন। রাত ও দিন যেমন কার্যগতভাবে ভিন্ন, একে অপরের সমান নয় বা উত্তম নয় তেমনি নারী ও পুরুষ কার্যগতভাবে ভিন্ন, একে অপরের সমান নয় বা উত্তম নয়। সমস্ত মানুষ কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে চিরুনির দাঁতের মত সমানভাবে দাঁড়াবে। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হল তাকওয়া বা ধার্মিকতা, গায়ের রং বা লিঙ্গ নয়।

এই নারীবাদী ইডিওলজির উপর ভিত্তি করে এখন পৃথিবীতে একটি সেক্সুয়াল রেভলুশন চলছে। যা আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার নামে চিনি। নারী পুরুষের মত হওয়ার চেষ্টা করছে এবং পুরুষ নারীর মত হওয়ার চেষ্টা করছে। আর এভাবেই আখেরী জামানা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সঃ এর ভবিষৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। তিনি (সঃ) বলেছেন, “পুরুষ নারীর পোশাক পরবে ও নারী পুরুষের পোশাক পরবে” (বুখারি)। তিনি (সঃ) বলেছেন, “নারীরা পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকবে” (আবু দাউদ)।

“দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা, ফুফু এবং অন্যান্য স্বজন মহিলাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে” (আহমাদ)।

এগুলো ইতোমধ্যে হয়ে গেছে এবং এগুলো নারীবাদী আন্দোলনের ফসল যা দাজ্জালের কাছ থেকে এসেছে। ব্যাপকহারে বিবাহবিচ্ছেদ, সমকামিতা, উভকামিতা, লিঙ্গ পরিবর্তনসহ আরো অনেক অশুভ বিষয়ের জন্ম দিচ্ছে দাজ্জালের এই নারীবাদী আন্দোলন। সোসাইটি ভেঙ্গে যাচ্ছে, মানবজাতি এগিয়ে যাচ্ছে অজানা ধ্বংসের পথে। বর্তমানে নারীরা তাদের বাচ্চাদের সঠিকভাবে মানুষ করতে পারছে না। ছোট থেকে সঠিক প্যারেন্টিং দিতে পারছে না। তারা ক্যারিয়ারের পিছে এমনভাবে ছুটছে যে তাদের বাচ্চাদের ও নিজ হাসবেন্ডকে সময় দিতে পারছে না।বাচ্চারা মানুষ হচ্ছে বুয়াদের কাছে ফলে বাচ্চারা সঠিক প্যারেন্টিং পাচ্ছে না। ছোট বেলা থেকে বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় একটা স্মার্টফোন। এই স্মার্টফোনের ক্ষতিকর সম্পর্কে জেনেও তাদের ক্যারিয়ারের ক্ষতি হবার ভয়ে তারা বাচ্চাদের ফোন ধরায় দেন।ফলে বাচ্চারা গেম খেলতে খেলতে পর্ণ এ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে, তারা মদ খাচ্ছে, জুয়া খেলছে। এসব কিছু মায়েদের সঠিক প্যারেন্টিং এর অভাবে হচ্ছে। অথচ আমাদের নারী সাহাবারা তাদের বাচ্চাদের কত্ত সুন্দর প্যারেন্টিং দিয়েছেন। মালেক ইবনে আনাস একজন গায়ক হতে চাইলে তার মাকে তার কত্ত সুন্দর প্যারেন্টিং দিয়ে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার স্বাদ দেখিয়েছেন।উম্মু সুলাইম তো খিদমতে নিয়জিত করার জন্য উপহার দিয়েছেন আনাসকে দিয়েছেন নবিﷺএর জন্য। আবার তিনি ছোট বয়স থেকে কালিমায়ে শাহাদাত শিখিয়েছিলেন, ছোট থেকে তার কোমল মনে জাগিয়েছেন নবিﷺ এর জন্য ভালোবাসা। উম্মু রাবীআ সম্পদ গুলা দুনিয়ার কাজে খরচ না করে ছেলের পিছে খরচ করে তাকে বানিয়েছেন আখিরাতের সাদকায়ে জারিয়া। আজ কোথায় সেই প্যারেন্টিং? আজ তো আমাদের বোনদের সময় নেয় তাদের বাচ্চাদের সময় দেওয়ার। সময় দিলে যে ক্যারিয়ার হবে না।

আজ আমাদের নারীরা স্বামিকে মর্যাদা দিতে জানেনা,করেনা স্বামির আনুগত্য। তারা স্বামির বরাবর হবার পশ্চিমা সংস্কৃতির খেলায় নেমেছে। কেউ কাউকে একটুকু ছাড় দিতে রাজিনা। তারা বসের সেবা করাকে নাম দিয়েছে ক্যারিয়ার অথচ স্বামির কাজ করা,দায়িত্ব পালন করলে আজ নাকি তারা দাসী হয়ে যায়, বাচ্চা জন্মদানে নাকি ক্যারিয়ার নষ্ট হয়। অধিক বাচ্চাদানে তাদের নাকি রিজিক কমে।অথচ আল্লাহ নিজে

বলছেন রিজিকের মালিক তিনি। বর্তমানে আমাদের নারীদের মনে এসব ভাবনা। এইজন্য অহরহ হচ্ছে ডিভোর্স, শান্তি মিলে না কোথাও। অথচ আমাদের নারী সাহাদের দেখুন তারা একেকজন কতটা স্বামিকে সম্মান করেছে,স্বামির আনুগত্য করেছে। আমাদের নবী ﷺ এর স্ত্রীদের দেখুন তারা রাসুলকে কতটা সম্মান ও আনুগত্য করতো।খাদিজা(রা) বৃদ্ধ বয়সেও নবি ﷺ এর জন্য খাবার বানিয়ে হেরা গুহায় এতোগুলা পাথর পাড় হয়ে যেতেন নবী ﷺ কে খাবার দিতে।কতটা স্বামির প্রতি তার বিশ্বাস ছিলো যে তিনি হেরা গুহার ঘটনা বিনাসন্দেহে বিশ্বাস করেছেন। তাঁকে অভয় দিয়েছেন।উম্মু আয়েশা(রা) রাসুল ﷺ কে কতটা ভালোবাসতেন। নবী ﷺ অন্য স্ত্রীদের সাথে দেখলো ঈর্ষানীত বোধ করতেন। কতটা সম্মান ও ভালোবাসা থেকে এমনটা হয়। উম্মু সুলাইম(রা) কে দেখুন তার সন্তান মারা যাবার পরেও তিনি সাথে সাথে স্বামিকে হাওমাও করে জানাননি। বরং স্বামি যখন সফর থেকে এলো তিনি তার সাথে ভালো ব্যবহার করে মিষ্টি ভাষায় কি সুন্দর বুঝালেন,আল্লাহর জিনিস আল্লাহ নিয়েছেন।

অথচ বর্তমানে আমাদের বোনদের মাঝে সবকিছুতে হতাশা। তারা সবকিছুতেই আল্লাহকে ভুলে যায়,স্বামির সাথে উত্তম আচারন করেনা। যেখানে আমাদের বোনদের আইডল হবার কথা ছিলো নারী সাহাবার,সেখানে আজ তাদের আইডল পশ্চিমা নারীরা,পশ্চিমা সংস্কৃতি।

কিন্তু আমাদের এমন নয়,নারী সাহাবাদের মতো হতে হবে। আমাদের ভিতর থেকে নারীবাদকে সরাতে হবে। পশ্চিমারা কখনো আমাদের আইডল হতে পারেনা,আমাদের আইডল শুধুমাত্র নবী ﷺ, তার সাহাবারা। আমাদের বাচ্চাদের সঠিক প্যারেন্টিং দিতে হবে। স্বামিকে অনুগত্য করতে হবে। ইসলাম ও নারী পুরুষকে সমতা দেয় তবে সেটাই দেয় যেটা নারী পারবে। কারো ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয়না। আমাদের পুরুষ ও নারীর গঠন,কাজ, শক্তি সব ভিন্ন এটা স্রষ্টা কতৃক। কখনো নিজেকে ভাবা যাবে না,পুরুষ পারলে নারী কেন পারবে না! পুরুষ পুরুষের কাজ করবে আর নারী নারীদের যেটা ইসলাম শিখিয়েছে আমাদের। আমাদের নারী সাহাবাদের দেখুন তারা নিজেরা বাচ্চাদের সঠিক প্যারেন্টিং দিয়েছে,স্বামির অনুগত্য করেছে,শিক্ষা অর্জন করেছেন,, সমাজ গঠন করেছেন কিন্তু সেগুলা ইসলামের ছায়াতলে থেকে।ইসলাম কখনোই কোনো নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়নি।

ইসলামে দাওয়াহ এর গুরুত্ব

দাওয়াহ' শব্দের অর্থ আহ্বান করা, ডাকা।

ইসলামে দাওয়াতি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসঙ্গে প্রশংসনীয়। কারণ এতে বহু বিধর্মী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার সুযোগ পায়।

কুরআনের ভালোবাসায় ও ইসলামকে সত্য জেনে অনেকে খুঁজে পান চিরস্থায়ী মুক্তির পথ। এই ফিরে আসার পথে তারা অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয় ইসলামি দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে।

কারণ যে 'দাওয়াত' তাদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের একজন করে থাকে।।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْم.ٌ

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ'তে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রতুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে' (হা-মীম সিজদা ৩৩-৩৪)।

আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার বিনিময়ে মানুষ সবচেয়ে উত্তম হ'তে পারে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

দাওয়াহ তাবলিগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা। বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম কোরআন ও হাদিসের আলোকে বলেন, দ্বীনি দাওয়াত, তাবলিগ, তালিম ও তারবিয়াতের কাজে সফলতার জন্য চারটি বিষয় থাকা জরুরি। এগুলো হলো:

১. মুহাব্বত

২.আজমাত

৩.হিকমাত

৪. খিদমাত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'তোমরা আহ্বান করো তোমাদের রবের পথে, হিকমাহ এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।' (সুরা-১৬ নাহল, আয়াত: ১২৫)।

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, প্রচার, নসিহত, ওয়াজ বা আল্লাহর দ্বিন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সব নবী ও রাসুলের দায়িত্ব। সব নবী তাঁর উম্মতকে তাওহিদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন। শিরক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বাড়ী থেকে বের হলেন, তখন আমরা আহলেছুফফার সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদে মধ্যে কে এমন আছে যে বুত্বহান অথবা আক্বীক্ব নামক স্থানে যাবে এবং দু'টি মোটা তাজা উটনী নিয়ে আসবে। যা চুরিও নয়, ছিনিয়েও নেয়া নয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সবাই যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি সকালে মসজিদে যাবে এবং দু'টি আয়াত শিখিয়ে দিবে অথবা (মানুষের সামনে) পরিবেশন করবে। এই আয়াত দু'টি উটের চেয়ে উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উটের চেয়ে উত্তম। এভাবে যত আয়াত পরিবেশন করবে তত উটের চেয়ে উত্তম হবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

'অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়ার উপদেশ দেয়। তারাই হ'ল ডানপন্থী, তারাই সফলকাম' (বালাদ ৯০/১৭)।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শিখে, যা মানব সমাজে খুবই প্রয়োজন।

একজন দাঈর গুনাবলি যেমন হবে:

১.দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিশুদ্ধতা

২.ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শীতা

৩.তাকওয়া ও ইখ্লাস

৪.যেদিকে আহ্বান করবে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা

৫.যার দিকে আহ্বান করছে, তার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা

৬.পরমত সহিষ্ণুতা ও আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা

৭.ধৈর্য ও অবিচলতা

৮.আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

৯.যেদিকে আহ্বান করবে সে বিষয়ে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা থাকা

১০.ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং চলার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা

১১.ত্যাগের মানসিকতা

১২. শব্দ ব্যবহার করা

১৩.ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালনে অভ্যস্ত হওয়া

১৪.বোধগম্যতার জন্য শ্রোতাদের অবস্থা বিবেচনা করা

১৫.সততা অবলম্বন এবং বানোয়াট বক্তব্য পরিহার করা

১৬.গীবত চর্চা না করা

১৭.আত্মসমাচলনা করা

নারীদের দাওয়াতি কাজে অবদান

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচারই করলেন না। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৬৭)

ইসলাম প্রচারে পুরুষদের মতো নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবজীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব।
এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই নারীরা হলো পুরুষদের সহোদরা।'

ইসলামের দাওয়াতি কাজে বর্তমান নারীর গুরুত্ব অনেক। বর্তমান যুগ জাহেলিয়াতের থেকে খারাপ যুগ। এইজন্য এই যুগে সবার মধ্যে ইসলামের চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এখানে ইসলামি কাজে ভাইয়েরা দাওয়াত বাহিরে বাহিরে দিতে পারলেও আমাদের নারীর পর্দার হুকুম থাকায় তারা চাইলেই বাহিরে যেতে পারে না আবার মাহরাম ননমাহরাম এর বিষয় আছে। এইজন্য আমাদের মায়েদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতি কাজ করতে আমাদের বোনদের ভূমিকা রয়েছে। আজকাল অনলাইনের যুগে দাওয়াতি কাজ করা আরো সহজ হয়ে উঠেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইসলাম প্রচার করতে,হালাল হারাম সম্পর্কে আমাদের মায়েদের জানাতে আমাদের বোনেরা অনেক অডিও/ ভিডিও কনফারেন্স করেন।সেখানে আমাদের বোনদের নানা বিষয়ের ওপর তালিম দেওয়া হয়। আল্লাহ আমাদের জন্য কি বলেছেন, আমাদের দায়িত্ব কি, আমাদের কেমন ভাবে জীবন পরিচালনা করতে হবে এসব বিষয়ে আমাদের বোনেরা কনফারেন্স করে থাকেন।

নিজ স্বামী/ সন্তান-সন্ততিকে ইসলামের সঠিক আদর্শ শিক্ষা দেয়া। সন্তানদেরকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি কাজ আর নেই। একজন নারী তার সন্তানদের প্রথম শিক্ষক এবং মায়ের কোল সন্তানের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসবে আমাদের নারীদের অবদান আছে।

আমাদের অনেক বোনেরা সদ্য দ্বীনে ফিরে আসেন তখন তারা বুঝে ওঠতে পারেননা কোথা থেকে ইলম অর্জন করবেন। আবার অনেক বোনেরা মাদ্রাসায় না পড়ার দরুন ইসলামে অনেক মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন না এইজন্য তারা অনলাইনে ঘাটাঘাটি করেন কিভাবে ইলম অর্জন করবেন। এখানে আমাদের বোনদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশি কারন সদ্য দ্বীনে ফেরা বোনকে, একজন নওমুসলিম বোনকে,একজন মাদ্রাসায় না পড়া বোনকে তারা দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। তাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়,ফরজ বিষয়,ফরজে আইন সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে থাকেন।বিভিন্ন বিষয়ে নাসিহা করে থাকেন। আমাদের বোনেরা মাহরাম মানে এইজন্য অনেক পুরুষ টিচারের কাছে ইলম অর্জন পারেনা এইজন্য মহিলা টিচারের দরকার পড়ে, এইক্ষেত্রেও আমাদের বোনেরা অপর বোনকে ইলম দিয়ে থাকেন।

আমাদের অনেক মা,দাদি,খালা আছে যারা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ইসলামিক বিষয়ে,তারা অনেক কিছু জরুরত বিষয় বলতে পুরুষদের লজ্জা পান এই বিষয়ে আমাদের নারীরা তাদের সাহায্য করে থাকেন। ফলে তারা সঠিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন। অনেক সময় গ্রাম- গঞ্জে আমাদের মা বোনেরা অনলাইনের ব্যবহার না জানার কারণে বা এসব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেননা। এসব ক্ষেত্রে আমরা বোনেরা সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তালিম দিতে পারি।

তাছাড়া একটা সন্তানকে কিভাবে সঠিক পারেন্টিং দেওয়া যায় এটা সম্পর্কে অনেক বোন জানেনা বা এই বিষয়ে অজ্ঞ। এইজন্য আমাদের দক্ষ বোনেরা এসব বিষয়ে তালিম দিয়ে সঠিক তথ্য আমাদের কাছে তুলে ধরেন। এইজন্য অনেক হাদিস এর ব্যাখা বুঝিয়ে, তাফসির বুঝিয়ে,এসব দিক আমাদের ভাইদের মতো বোনদের ও দাওয়াতি কাজে গুরুত্ব ভূমিকা রয়েছে।

নারীদের প্রধানতম কর্তব্য হলো সমাজের বিভিন্ন মহলের নারীদের কাছে ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছানো, দ্বীনের আলো ছড়ানো। যেটা আমাদের বোনেরা করে থাকেন।

ইসলামকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে দাওয়াত ও তাবলীগের বিকল্প নেই। প্রচারের কাজটি যত সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হয়, প্রসারের কাজটিও তত সহজ হয়। কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে ব্যাপক তালীম দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হবে সফলকাম’ {আলে ইমরান ১০৪}। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আপনি যদি এরূপ না করেন, তাহ’লে আপনি রিসালাতের বাণী পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের নিকট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের পথ দেখান না’ {মায়েদা ৬৭}।

এইজন্য পুরুষদের পাশাপাশি আমাদের নারীদের অবদান রয়েছে দাওয়াতি কাজে।

যারা জানে অথচ মানুষকে জানায় না তাদের উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি যে সমস্ত সুস্পষ্ট বিষয় ও হেদায়াতের বাণী মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পরও যারা (মানুষ থেকে) গোপন রাখে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত' {বাক্বারাহ ১৫৯}।

নারীদের দাওয়াতি কাজের পরিধি ও বিস্তৃতি

নারীরা যেসব জায়গায় দাওয়াহ দিতে পারেন

১. নারীরা নিজ মাহরামকে দাওয়াহ দিবে। আমাদের নারীদের জন্য যেসব ১৪ জন পুরুষ জায়েজ আছে তাদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ দিবেন আমাদের মেয়েরা।
২. নিজ সন্তানকে দাওয়াহ দিতে পারবেন।
৩.নিজ আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশিকে দাওয়াহ দিতে পারবেন (অবশ্যই মাহরাম হওয়া লাগবে)
৪.নারীরা নিজের মাহরামের মাধ্যমে বাহিরে সবার মধ্যে দাওয়াহ দিতে পারবেম
৫.সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনায় এবং স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী পর্দা সহকারে মহিলাগণ দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারেন।
৬. অনলাইনে দ্বীনি বোনদের কাছে দাওয়াহ দিতে পারবেন
৭.স্কুল, কলেজ ভার্সিটিতে নিজ বান্ধবীদের মাঝে দাওয়াত দিতে পারবেন।
৮. ইংরেজি ,এ্যারাবিক বা বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হলে বাইরের দেশে দাওয়াতি কাজ করতে পারবেন।

নারীদের দাওয়াতি কাজের পদ্ধতি

বর্তমানে নারীরা দাওয়াতি কাজ বিভিন্ন মাধ্যমে করতে পারেন। অনলাইনে আরো সহজ হয়ে উঠেছে দাওয়াতি কাজ করা। আমরা চাইলেই এই কাজগুলা সহজে করতে পারি। বর্তমানে দাওয়াতি কাজ দুইভাবে করা যেতে পারে ১. অফলাইন ২. অনলাইন। এই দুই ক্ষেত্রেই নারীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

দাওয়াতি কাজের জন্য প্রথমেই আমাদের নিয়ত শুদ্ধ করতে হবে। নিয়ত শুদ্ধ না হলে কোনো কাজে সফলতা আসে না।

ঈমান-আকীদা পরিশুদ্ধ করা : ঈমান শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা, আর আকীদার অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস। কুরআন হাদীসে যে সব বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, সেগুলোকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করার নামই ঈমান। আর আমল-ইবাদত হচ্ছে ঈমানের পূর্ণতা। যার ঈমান নেই তার কোন আমল আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। রূহ ছাড়া যেমন শরীরের কোন মূল্য নেই, তদ্রুপ ঈমান ছাড়া আমলের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন। যারা কাফের তথা যাদের ঈমান নেই তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত।' (সূরা নুর : আয়াত ৩৯)

অফলাইনে

১.নিজ আবাস গৃহে পার্শ্ববর্তী মহিলাদেরকে ইসলাম শিখানোর ব্যবস্থা করা।

২.নিজ স্বামী/ সন্তান-সন্ততিকে ইসলামের সঠিক আদর্শ শিক্ষা দেয়া। সন্তানদেরকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি কাজ আর নেই। একজন নারী তার সন্তানদের প্রথম শিক্ষক এবং মায়ের কোল সন্তানের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রতিটি মা যদি তার সন্তানকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলেন তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষা তার জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ।

৩.স্বামী বা মাহরাম সহকারে দূরে কোথাও দাওয়াতি কাজের জন্য গমন করা। কিন্তু স্বামী বা মাহরাম ছাড়া দূর দূরান্তে দাওয়াতি কাজ করতে যাওয়া বৈধ নয়; অন্য মহিলাদের সাথে হলেও। যেমনটি বর্তমানে অনেক স্থানে দেখা যায়।

৪.মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত হলে ছাত্রীদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম করা।

৫.মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ছাত্রী হোস্টেল, হসপিটাল বা নিজস্ব কর্মস্থলে ছাত্রী/মহিলা সহকর্মীদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬.তালিমি বৈঠক পরিচালনা করে। পরিবার সদস্য বা অন্যান্যদের সপ্তাহে একবার করে তালিমে বসিয়ে।

৭.মেয়েদের সাদাকা দেয়ার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা

৮.তরুণদের গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা করা যেন মুসলিম উম্মাহ পরবর্তী প্রজন্মে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পেতে পারে।

৯.দাওয়াত গ্রহণকারীর সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলুন বা ভালোভাবে উপস্থাপন করুন।

১০. মানুষের নাম তার নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাই যথাসম্ভব মানুষের নাম মনে রাখার চেষ্টা করুন।

১১. আপনি যাকে দাওয়াত দেবেন তাকে গুরুত্ব দিন ও এটা মন থেকেই করুন।

অনলাইনে

১. লেখালেখি করার মাধ্যমে : বিভিন্ন বিষয় লেখালেখি করুন বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিষয়,হালাল হারামের বিষয়, রাসুল ও তার সাহাবিদের জীবনি।

২.ঘরে বসে ইসলাম বিষয়ে লেখা ও তা বই/লিফলেট আকারে প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠানো।

৩.ঘরে বসে ওয়েবসাইট পরিচালনা করা ও তাতে ইসলাম বিষয়ে লেখালেখি করা।

৪.ফেসবুক, টুইটার সহ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়া।

৫.মোবাইল, মেমোরি কার্ড বা ফ্লাশের মাধ্যমে সহীহ আকিদা নির্ভর আলিমদের বিভিন্ন লেকচার অন্যদের সাথে শেয়ার করা অথবা ভালো মানের বক্তৃতাগুলো বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করে সেগুলো ছড়িয়ে দেয়া।

উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে নারীদের করনীয়/ অবদান

উম্মার ক্রান্তিলগ্নে আমাদের নারীরা কিভাবে অবদান রাখতে পারেন তা হলো;

১. নিজেকে হিফাজত করে। পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে নিজেকে হিফাজত করতে হবে।

২. নারীবাদি হওয়া যাবেনা। কখনো এমন খেয়াল শয়তান দিলে আমরা সাথে সাথে রুকইয়াহ করবো,এই টপিকে শায়েখদের লেকচার দেখবো।
৩. অবহেলিত ও অত্যাচারিত মজলুম ভাইদের জন্য দোয়া করবো বেশি বেশি,কখনো দোয়া তাদের কথা বলা ছাড়বো না।
৪. গাজওয়াতুল হিন্দ এর জন্য প্রস্তুত হবো। বাসায় যেভাবে সম্ভব নিজেকে গাজওয়াতুল হিন্দ এর জন্য প্রস্তুত করবো।
৫.উম্মাহ নিয়ে ফিকির করবো।
৬.উত্তম প্রজন্ম গঠন করবো। সন্তানদের সঠিক প্যারেন্টিং দিবো। ট্রান্সজেন্ডার এর ভয়াবহ দিক বুঝবো।
৭.উত্তম নেতার জন্য দু'আ করবো।
৮. নারী মাহাবীদের অনুসরণ করবো।
৯.বোনদের স্ট্রং দাওয়াহ নেটওয়ার্ক তৈরি করবো।
১০.ইসলামি জ্ঞান বেশি বেশি চর্যা করা। বোনদের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে হবে।
১১. শহীদ মৃত্যুর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া। বেশি বেশি দরুদ পড়া ও ইস্তিগফার করা।
১২. নিজ মানুষদের গাজওয়াতুল হিন্দ ও অন্যান্য জিহাদের জন্য অনুপ্রেরনা দেওয়া।
১৩.বাসায় ইউটিউব দেখে বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম ও প্রতিরক্ষা মূলক কারাতে শিখতে পারেন। এতো মন ও ভালো থাকবে।
১৪.ইউটিউব থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।
১৫.বাসায় ভালো মানের খেলনা স্নাইপার, বন্দুক, তীর দিয়ে প্রাক্টিস করতে পারেন।
১৬.কবুতর, মুরগী, হাঁস নারীরা জবেহ করবেন।
১৭.নিজেদের বাচ্চাদের যেন শেখাতে পারি এমন ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ ن عَلَيْهِمُ الْمَائِيَةُ الْاتَنَا فُوْا وَلَا نَي زُنُوا وَا بشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون. َ

নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, একার অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় এবং বলে- 'তোমরা ভয় পেয়ো না,/ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যাম ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল "হা-মীম আস-সাজদাঃ ৩০"

*যেসব তাওহীদবাদী বোনেরা বিভিন্ন ক্যাম্পাসে হলে থেকে পড়াশোনা করছেন, হলে দাওয়াতী টীম গঠন করুন। হলে নামাজঘর-ভিত্তিক দাওয়াহর রূপরেখা :

১। নামাজঘরে পাঠাগার স্থাপন।

২। সাপ্তাহিক পাঠচক্র ও হালাকা।

৩। দৈনিক একটি রুমে বোনদের সাথে দাওয়াতী মোলাকাত।

৪। আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো একজন শাইখের লেকচার ইউটিউব থেকে একসাথে অনেক বোন মিলে শোনা ও নিজেদের মাঝে আলোচনা। অন্তরের খোরাক পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৫। ভূরাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস-দর্শন ও শরীয়াহ-সচেতন নারী তৈরি করা।

৬। শরীয়াহর সকল বিষয়ে অনড় অনমনীয় দাওয়াহ। আখলাকী, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আমলী।

৭। নবীনদের তৈরি করে দাওয়াতী চেইন তৈরি। যাতে আপনি হোস্টেল ছাড়লেও কাজ বন্ধ না হয়।

৮। দৈনিক হাদিসের হালাকা ও সেখানে নতুন নতুন বোনদের জুড়াতে হবে। আখলাক ও মুহাব্বতের মাধ্যমে দীনহারা বোনদের মাঝে আকর্ষণ তৈরি। অন্যান্য মেহনতের সাথে তর্কাতর্কিতে না যাওয়া।

৯। হলে কেন বোনের যেকোন সাহায্য লাগলে তা সলভ করার চেষ্টা করা। (আর্থিক ইত্যাদি)

ঘরে ঘরে মুজাহিদা মা তৈরি হলে মুজাহিদ প্রজন্ম তৈরি হবে।

-মুহতারাম শামসুল আরেফিন শক্তি (হাফি)

সমাপনী

সর্বোপরি, ইসলামে আমাদের নারীদের অনেক ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। আমাদের নারী সাহাবাগণ ইসলাম প্রচারে অনেক অবদান রেখে গেছে। বর্তমান সময়ে অবস্থা অনেক খারাপ,আমাদের উচিত আমাদের নারী সাহাবাগণদের ফলো করা। আমাদের দাওয়াহ কাজ পরিচালনা করে যেতে হবে, সন্তানদের সঠিক প্যারেন্টিং দিতে হবে। হে আমার বোন! আপনার মনে যেনো কখনো মনে না হয় ইসলাম আমাদের স্বাধীনতা

দেয়নি। অথচ দেখেন যুগ যুগ ধরে আমাদের নারী সাহাবা ও বিখ্যাত নারীগণের অবদান। কোন ক্ষেত্রে অবদান নাই বলেন! সবক্ষেত্রেই আমাদের নারীদের ভূমিকা ছিলো। পশ্চিমা সংস্কৃতি বলে ইসলাম নারীদের স্বাধীনতা দেয়নি,, আসলেই কি তাই বোন আমার! না আসলে তাই নয়,ইসলাম ধর্মের মতো স্বাধীনতা অন্য ধর্মে দেওয়া হয়নি। অশ্লীলতা কখনো স্বাধীনতা হতে পারেনা। যুগে যুগে নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান ছিলো এবং ভবিষ্যৎ ও একজন নারীর ওপরই নির্ভর করছে।

যে কথা না বললেই নয়

আজ তোমার কানে কিছুকথা বলতে চাই, আমার প্রত্যাশা, কথাগুলো তোমার কানে পৌঁছার পূর্বে তোমার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে। তুমি মুনাফিকদের সংখ্যাধিক্যেরকারণে পথভ্রষ্ট হয়ো না। যারা হিজাবের কারণে সংকীর্ণতা বোধ করে, যারা যুবকদের সাথে মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে, যারা সব সময় বিভিন্ন অন্যায় ও মন্দ কাজে মত্ত থাকে। তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তুমি ধোঁকায় পড়ো না। প্রতারিত হয়ো না।

ভোগ-বিলাস ও বিনোদনইতো হচ্ছে তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই তারা আজ বেহায়াপনায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। অন্যায় আনন্দ- বিনোদনে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তোমার জীবন তো তাদের মতো নয়। প্রিয় বোন আমার।আমরা আজ এমন এক সময় অতিক্রম করছি যখন ফেতনা-ফাসাদে ছেয়ে গেছে সমগ্র পৃথিবী। আর হারামও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ আমাদের জীবন। আমরা ওই সময়ের খুবই সন্নিকটে যে সময় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে। যে সময়ে দীনের উপর অটল থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো দুঃসাধ্য হবে। সে সময়কার একজন আমলকারীর প্রতিদান পঞ্চাশ জনের সমপরিমান হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। তা কী তাদের পঞ্চাশ জনের মধ্য হতে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ জনের।

শেষ যামানায় একজন আমলকারীর প্রতিদান হবে অনেক, বিশাল, অফুরন্ত। এবং তার সাহায্যকারীর সংখ্যা থাকবে খুবই নগণ্য। কেননা বহু পাপাচারীর মধ্যে সে থাকবে

অনেকটাই অসহায়। সকলেই গান-বাজনায় লিপ্ত থাকবে। কিন্তু সে এগুলোতে লিপ্ত হবে না। সকলেই অন্যায়- অশ্লীলতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিবে, কিন্তু সে ভাসাবে না। সকলেই পাপাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকবে, কিন্তু সে থাকবে তাওহীদের উপর অটল অবিচল।

মুসলিম শরীফে এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী (সা) বলেন, ইসলামের সূচনা হয়েছে গরীব অসহাদের মধ্য দিয়ে অচিরেই তা অসহায় অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং অসহায়দের জন্য সুসংবাদ।

বুখারী শরীফে এসেছে, নবীজী (সা) বলেন, তোমাদের প্রত্যেক ভবিষ্যতকাল বর্তমান কালের তুলনায় মন্দ ও নিকৃষ্ট হবে। তোমাদের মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

(সূত্র : Sheikh Dr.Muhammad Bin Rahman Arifi)